

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ الْجَنَاحَيْنِ

মুমিনের গুণাবলী

মাওলানা আবুল হোসাইন

মুমিনের শুণাবলী

মাওলানা আবুল হোসাইন

**আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার**

**মুমিনের গুণাবলী
মাওলানা আবুল হোসাইন**

ISBN : 978-984-8808-41-2

**প্রকাশক
প্রকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত**

**প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭**

**প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর-২০১২ ইসায়ী
মুহররম-১৪৩৪ হিজরী
অগ্রহায়ণ-১৪১৯ বাংলা**

**প্রচ্ছদ
আহসান কম্পিউটার হাউজ
কম্পিউটার কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার
কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫**

**মুদ্রণ
র্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫**

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

**Muminer Gunaboli by Mawlana Abul Hossain Published
by Ahsan Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. First Edition
December 2012**

Price Tk. 80.00 only

পূর্বাভাষ

হৃদয়ের সকল আবেগকে উজাড় করে মহান আল্লাহ রাবুল আলামীনের দরবারে আলীশানে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত পৃথিবীর একমাত্র গ্রহণযোগ্য আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআনুল কারীম তাঁর প্রিয় বকুল সায়িদিনা মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে দান করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

হৃদয়ের সকল ভালোবাসাকে যিন্তি করে অগণিত দরদ ও সালাম পেশ করছি, মানবতার মহান মুক্তির দৃত এবং শিক্ষক, সায়িদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়িন, দোজাহানের বাদশাহ, হতাশায় জর্জরিত পৃথিবীর আলোর একমাত্র পাঞ্জেরী, যাঁর আনীত পথেই আমাদের পথ চলা বিশ্ববী জনাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সর্বোচ্চ জান্নাত কামনা করছি সেই সব আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাদের জন্য যাঁদের ঈমানী চেতনা আমাদের জন্য ঈমানী পথে পথ চলার মাইলফলক এবং অনুপ্রেরণার পাথেয়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বনি আদম সফলতার অঙ্গে ঘূরে বেড়ায়। এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে সফলতা চায় না। তবে প্রত্যেক মানুষ একই ধরনের সফলতা চায় না, কেউ চায় অর্থের সফলতা, কেউ চায় জ্ঞানের সফলতা, কেউ চায় স্বাস্থ্যের সফলতা, কেউ চায় আত্ম-মর্যাদার সফলতা আবার কেউ চায় ক্ষমতার সফলতা। কিন্তু মহামহিয়ান এই বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহ রাবুল আলামীনের ঘোষণায় সফল একমাত্র তারাই যারা প্রকৃত মুমিন হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

Successful indeed are the Believers

“নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।” (সূরা মু’মিনুন : ১)

উক্ত আয়াতের এর মূল শব্দ হলো ফ্লাহ (ফালাহ) ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

যেমন- أَفْلَحَ الرَّجُلُ - مানে হচ্ছে- অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষ্য পৌছে গেছে, আচর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। سُوْتَرَاٰؑ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مানে হচ্ছে- অবশ্যই নিশ্চিতভাবেই মুমিনরা সফলতা লাভ করেছে।

একজন ছাত্র যখন সফলতার শীর্ষে পৌছে যায় তখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত তাকে সফলতার শীর্ষে পৌছে দিয়েছে। সুতরাং পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাকুল আলামীন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যগুলোই পারে সর্বোত্তম মুমিনদের কাতারে আমাদের পৌছে দিতে। আর এই লক্ষ্যেই আমার এই শুন্দর প্রয়াস। মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহ রাকুল আলামীন আমাদের সকলকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের মধ্যে লালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মধ্য দিয়ে জালাত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রাক্রমশালী আল্লাহর একান্ত মুখাপেক্ষী
মাওলানা আবুল হোসাইন
০৪.০৯.২০১২ ইসায়ী

তোহফা

মানব জাতির একমাত্র পথ নির্দেশক
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা.) এর জন্য।

‘মানুষ যখন নিজকে সঠিকভাবে চিষ্টে পারে
তখনই সে পারে মহামহিয়ানের পরিচয় পেতে।

অহীর জ্ঞান আর তাকওয়াই পারে
মানুষকে সফলতার শীর্ষে পৌছে দিতে।
সফল মূমিন যে হতে পারে
উপযোগী হয় সে জানাত পেতে।’

সূচিপত্র

- মুমিনের পরিচয় ॥ ৭
মুমিন অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে ॥ ৮
মুমিন নামাযে বিনয়ী এবং ন্ত্র হবে ॥ ১০
মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে ॥ ১১
মুমিন যাকাতের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকবে ॥ ১৩
মুমিন তার লজ্জাহানের হেফায়ত করবে ॥ ১৫
মুমিন আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে ॥ ১৭
মুমিন নিজের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হয় ॥ ১৯
মুমিন ভীত হয়ে যায় আল্লাহর স্মরণে ॥ ২২
মুমিনের ঈমান আল্লাহর আয়াতের সম্মুখীনে বেড়ে যায় ॥ ২৪
মুমিন এক আল্লাহর উপরই ভরসা করে ॥ ২৬
মুমিন নামায কায়েম করে ॥ ২৮
মুমিন আল্লাহর দেয়া রিয়িক থেকে দান করে ॥ ৩১
মুমিন রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে ॥ ৩৩
মুমিন রবের সাথে কাউকে শরীক করে না ॥ ৩৫
মুমিন আল্লাহর যমীনে ন্ত্রভাবে চলে ॥ ৪০
মুমিনের আচরণ মূর্খতার জবাবে হয় শান্তিপূর্ণ ॥ ৪৩
মুমিন রাত কাটায় আল্লাহর ইবাদতে ॥ ৪৫
মুমিন সর্বদা আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চায় ॥ ৪৯
মুমিন অপচয় করে না— কৃপণও হয় না ॥ ৫২
মুমিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না ॥ ৫৫
মুমিন মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা সাক্ষী হবে না ॥ ৫৯
মুমিনরা হবে পরম্পর ভাই ভাই ॥ ৬২
মুমিন হবে ধৈর্যশীল ॥ ৬৬
মুমিন সত্যবাদী হবে ॥ ৭০
মুমিন হবে আল্লাহর অনুগত বাস্তা ॥ ৭২
মুমিনের জান-মাল একমাত্র আল্লাহর জন্য বিসর্জন হবে ॥ ৭৫
মুমিন হবে তাওবাকারী ॥ ৭৮
মুমিন হবে ইবাদতকারী ॥ ৮১
মুমিন হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী ॥ ৮৫
মুমিন আল্লাহর যমীনে ভৱণ করে ॥ ৮৭
মুমিন রুকুকারীদের সাথেই রুকু করে ॥ ৯৫
মুমিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে ॥ ৯৮
মুমিন আল্লাহ দেয়া সীমা রক্ষা করে ॥ ১০৪
মুমিন কখনো নিরাশ ও হতাশ হয় না ॥ ১০৬
একনজরে আল কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ॥ ১১২

মুমিনের পরিচয়

মুমিন আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাসকারী বা বিশ্বাসী। আর পারিভাষিক অর্থে মুমিন হল ছয়টি বিষয়ের উপর তথা “আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর নায়িলকৃত সকল কিতাবের উপর, সকল নবী-রাসূলদের ওপর, পরকালে পুনরুৎস্থিত হওয়ার উপর এবং লিপিবদ্ধ তাকদীরের উপর” যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করে, তাকেই মুমিন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে জিবরাইল (আ.) নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٍّ . (بخارى و مسلم)

Believe in Allah, in his angels, books, apostles/prophets, in the day of judgement and also in fortune that determines good or bad.

“আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাতের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি তোমরা ঈমান আনো”। এক কথায় বলতে গেলে মুমিন তাকেই বলা হয় যে (প্রাথমিকভাবে) غَيْبُ (অদৃশ্য) এর প্রতি বিশ্বাসী হয়। হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি পাঁচটি কখনই غَيْبُ (অদৃশ্য) মুক্ত ছিল না। একটি বিষয় কিছু সময়ের জন্য পাঁচটি কখনই غَيْبُ (অদৃশ্য) মুক্ত ছিল।

আর তা হলো- নবী-রাসূলগণ অর্থাৎ যখন নবী-রাসূলগণ ছিলেন তখন লোকেরা তাদেরকে দৃশ্যমান অবস্থায় দেখতে পেত। কিন্তু এখন ছয়টি বিষয়ের মধ্যে কোনটিই দৃশ্যমান নয় বরং অদৃশ্য অর্থাৎ দেখা যায় না।

আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে গেলে বলা যায়- নবী-রাসূলগণ যে নিজেদের নবী-রাসূল বলে পরিচয় দিয়েছেন এটি সরাসরি আল্লাহ এসে সাঙ্গী দিয়ে যাননি। আমরা মহান আল্লাহকে দেখতে পাই না, তাঁর ফেরেশতাদের দেখা যায় না। তাঁর নায়িলকৃত কিতাব বিশেষ করে কোরআন তাঁর পক্ষ থেকে নায়িল হয়েছে তা আমরা দেখিনি এবং সাহাবীগণও সরাসরি কোরআন নায়িল হচ্ছে এমনটি

দেখেননি বরং রাস্তার কাছে নাযিল হয়েছে পরে রাস্তা (স.) তাদের নিকট তা উপস্থাপন করতেন। এরপর সাহাবীগণ তা গ্রহণ করতেন পূর্ণ ঈমানের সাথে, পরপারে পা রেখে কেউ পুনরায় জীবন লাভ করেছে আমরা তা দেখিনি এবং তালো-মন্দ আল্লাহক কর্তৃক নির্ধারিত তাও আমরা দেখিনি।

যৌক্তিকতাকে অচাধিকার দিলে বলতে হয়, কোন দৃশ্যমান বিষয়কে বিশ্বাস করতে হবে এর কোন ভিত্তি নেই। আর ভিত্তিহীন কোন কথাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বলতে পারেন না। যেমন কেউ আপনার সামনে একটি আপেল এনে বললো বিশ্বাস করুন এটি একটি আপেল। এক্ষেত্রে প্রশ্নের যেমন ভিত্তি নেই, তেমনি বিশ্বাসেরও কোন প্রয়োজন নেই। আবার কেউ হাতের মুঠোয় একটি চাবি লুকিয়ে বললো বিশ্বাস করুন আমার হাতের মুঠোয় একটি চাবি আছে অথচ আপনি জানেন না তার হাতের মুঠোয় কি আছে। এক্ষেত্রেই কেবল আপনার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাস করলে আপনি তার প্রতি ঈমান আনলেন অর্থাৎ মুমিন হলেন আর অবিশ্বাস করলে ঈমান আনেননি বা মুমিন হননি।

মুমিন অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে

অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন মানে- যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। যেমন- আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আবেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের ওপর আস্তা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমান বিলগায়ের বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।

আল কোরআন থেকে কেবল তারাই হেদায়াত লাভ করবে যারা অদৃশ্যমান বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুমিন হবে। আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে, না বুঝে, পরিমাণ বা ওজন না করে, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ-আস্তাদন না নিয়ে তোমার মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না, তাহলে সে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না, অদৃশ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস একটি পরীক্ষার মাধ্যম। আর এ পরীক্ষার মেয়াদ গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হওয়া পর্যন্ত। গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হলে সংশোধনের অবকাশ শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা পরিত্রে কোরআনে ইরশাদ করেন-

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّثْلُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ.

They say : "Why is not an angel sent down to him?" If we did send down an angel, the matter would be settled at once, and no respite would be granted them.

"তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফয়সালা হয়ে যেত, তখন আর তাদের অবকাশই দেয়া হতো না।" (সূরা আল আনআম : ৮)

অর্থাৎ ইমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়-সীমা ও অবকাশ লাভ করেছ এর সময়-সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যে রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন ছাড়াই এ অদৃশ্য সত্যগুলোকে সত্য বলে অন্যায়েই মেনে নিবে এবং শুধু নিজেই বিশ্বাস করে ক্ষান্ত হবে না বরং অন্যকেও বিশ্বাস করতে উপদেশ দিবে। শুধু তাই নয় কাউকে অঙ্গীকার করতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যে (غَيْبُ) বিশ্বাসীদেরকেই মুমিন বলে সার্টিফাই করেছেন অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে, তারাই কেবল মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ — فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ — الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ —

This is the Book : in it is guidance sure. Without doubt. to those who fear Allah. Who believe in the Unseen.

"এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। হেদায়াত সেই মুস্তাকিদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল বাকারা : ২-৩)

মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো তার মধ্যে মুমিন হতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকতে পারবে না। কেননা, পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষা কেবল মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। আর সেটি হল সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কিনা? এবং সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো তার নেতৃত্বিক শক্তি আছে কি-না? যেমন মূসা (আ.) বিশাল সাপ দেখে দৌড় দিলেন আর আল্লাহ তায়ালা বললেন মূসা ভয় পেয়েও না সাপটি ধর। মূসা (আ.) একটুও দেরি করলেন না আল্লাহ তায়ালা বলার সাথে সাথে সাপ ধরে ফেললেন। এর নাম হল মুমিন।

মুমিন নামাযে বিনয়ী এবং ন্তৃ হবে

মুমিন খুশুর সাথে সালাত আদায় করবে। খুশু শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, বশীভৃত হওয়া, বিনয় ও ন্তৃত্বা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দেহ ও মন দুয়ের সাথেই হবে। মনের খুশু হলো— মানুষ কারও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতার দরুন তার সামনে সম্ভৃত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর অপরদিকে দেহের খুশু হলো— যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যস্ত হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত থাকবে, কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ হবে। খুশুর সম্পর্ক মনের সাথে এবং মনের খুশু আপনা-আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়। নামাযে খুশু বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীস শরীরে এসেছে— একদা নবী করীম (স.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাঢ়ি নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, “যদি তার মনে খুশু থাকত তাহলে তার দেহেও খুশুর সঞ্চার হতো।”

নামাযের প্রত্যেকটি কাজ ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে করতে হবে। একটি কাজ পুরোপুরি শেষ না হতেই অন্য কাজ আরম্ভ করা যাবে না। নামাযে কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকলে এক হাতে তা সরিয়ে দেয়া যাবে, কারণ ঐ জিনিসটাই নামাযে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু বারবার হাত নাড়া-চাড়া অথবা দুই হাত এক সাথে ব্যবহার করা যাবে না। ডানে বামে ফিরা যাবে না, মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকানো যাবে না, চিন্তা-ভাবনা, হিসাব-নিকাশ করা যাবে না। দৃষ্টিকে সামনের দিকে রাখতে হবে। হানাফি ও শাফিয়িদের মতে, দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করা যাবে না। মালিকিগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত। নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার পরিধেয় বন্ধ গুটান, ঝাড়া বা তা নিয়ে ব্যক্ত থাকা জায়েয় নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় সিজদার জায়গা, বসার জায়গা পরিষ্কার করা যাবে না। গর্বিত ভঙ্গিতে খাড়া হওয়া, অধিক জোরে কোরআন পড়া, জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা এবং তাড়াহড়া করে টপ্টপ নামায পড়া, আখেরী বৈঠকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে সতর্ক করা চরম বেয়াদবী, একজন মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন সে পৃথিবীর সকল কিছু থেকে তাঁর মন মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, দেহ-মন সবই এক আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন এক আল্লাহর দিকে মুতাওয়ায়াহ হলেন। কোরআনের ভাষায়-

إِنَّ وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ مَا

“For me, I have set my face, firmly and truly, towards Him who created the heavens and the earth.

“আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরালাম সেই মহান সন্তার দিকে যিনি ঐ আকাশ আর যমীনের সৃষ্টিকর্তা।” (সূরা আল আনআম : ৭৯)

অর্থাৎ, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, তক এবং কালৰ সবই এক আল্লাহৰ জন্যই হয়ে যেতে হবে। মুমিন নামায পড়বে আর ভাববে-মনে করবে, আমি আল্লাহৰ সামনে দণ্ডায়মান, আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ততপক্ষে এতটুকু ভাবতে হবে বা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে

অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা ও কাজ যাতে কোন ফল পাওয়া যায় না যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয় এবং উদ্দেশ্যও ভাল নয়। যেগুলোর আসলে প্রয়োজন নেই, না বললেও চলে। যার কারণেই একজন মুমিন সকল প্রকার অনর্থক এবং বাজে কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং এটি তার ঈমানের দাবিও বটে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে-

— وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْرِ مَرُوا كِرَاماً —

And If they pass by futility, they pass by it with honourable.

“এবং তারা (মুমিনরা) অর্থহীন বাজে ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদা রক্ষা করে তা পরিহার করে চলে যায়।” (সূরা আল ফুরকান : ৭২)

একজন মুমিনের সম্মান-মর্যাদা অপরিসীম, অনর্থক কথা ও কাজ তার মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল্যহীন কোন কথা বা কাজ নিজের মধ্যে আনতে পারে না। মুমিনগণ সর্বদা সময়ের মূল্য দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকে। সে এ দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করবে। একজন ছাত্র যখন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছে সে তখন মনে করে তার পরীক্ষার হলের প্রতিটি মুহূর্ত তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী। এ অনুভূতির কারণে সে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশংসনের সঠিক উত্তর লেখার চেষ্টায় ব্যয় করে। একটি মুহূর্তও বাজে কাজে ব্যয় করে না। ঠিক তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনকালকে এমনভাবে পরিচালনা করে যা পরিণামের দিক দিয়ে ইহকলীন কল্যাণ ও পরকলীন মুক্তি নিশ্চিত হয়। মুমিন হয় একজন শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ

প্রকৃতির অধিকারী এবং পরিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বতাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। সে সর্বদা ফলদায়ক কথা ও কাজ করে চলে এবং আজে-বাজে, গল্প-গুজব করা তাঁর স্বতাব হতে পারে না। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস (সত্যের সাথে মিল রেখে) পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেটে উঠতে পারে না।

আল্লাহর রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল মুমিনকে জান্নাতে অনেক নেয়ামতের অধিকারী করবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সেখানে তাদেরকে কোন প্রকার বাজে কথা শুনাবেন না। আল্লাহর তায়ালা বলেন-

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَأْغْيَةً —

Where they shall hear no (word) of vanity.

“সেখানে তারা (মুমিনরা) কোন বাজে কথা শুনবে না।” (সূরা গাশিয়া : ১১)

আল্লাহর তায়ালা যে আচরণকে জান্নাতের নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মুমিন সে নেয়ামতের বিপরীত কোন আচরণ দুনিয়ায় করতে পারে না।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) শিখতে, শৈশবে, ঘোবনে, বৃক্ষে জীবনের কোন অংশেই অহেতুক কথা ও কাজ করেননি। অর্থাৎ আরবের সে সময়ের কালচারই ছিল অহেতুক কথা ও কাজের সমাহার। হ্যরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, “একদা রাতের বেলায় আমি মক্কার এক টিলার চূড়ায় অন্য একজন কুরাইশ বালকের সাথে ছাগল চুরাছিলাম, হঠাৎ ইচ্ছে হলো আরবীয়দের ‘সমর’ গল্পের আসরে গিয়ে আজ রাতে একটু আনন্দ করি। সঙ্গীকে বললাম, আমার ছাগলটার দেখাশুনা কর আমি একটু ‘সমর’ শুনে আসি।

কিছু দূর যাবার পর এক বস্তির কাছাকাছি যেতেই বাজনা ও ঢোলে তবলার আওয়াজ কানে ভেসে এল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কোন এক লোকের বিয়ে হচ্ছে। তখন কৌতুহলবশতঃ যখন আমি সেই পথে পা বাড়াতে ইচ্ছে করলাম অঘনি আমার ভীষণ ঘূম পেল। এমন এক ঘূম যে, একটুও চলতে পারলাম না। ঐখানেই ঘূমিয়ে পড়লাম। ভোরে সূর্যের কিরণের উভাপে অবশ্যে ঘূম ভাজে।” (বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী)

মুমিন প্রতিটি কাজ আর কথার পূর্বে চিন্তা করে আমার তো প্রতিটি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হাশরের ময়দানে সবকিছু আমার সামনে উপস্থিত করা হবে আর হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। কেননা, আল্লাহর তায়ালা বলে দিয়েছেন-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ — وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

Then shall anyone who has done an atom's weight of good.
See it. And anyone who has done an atom's weight of evil,
shall see it.

“অতঃপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং
অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তাও দেখতে পাবে।” (সূরা আয়
যিলযাল : ৭-৮)

মুমিন যাকাতের প্রক্রিয়ার সত্ত্বে থাকবে

ইসলামী পরিভাষায় যাকাতের দুটি অর্থ দাঁড়ায়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা
পরিশুল্ক করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুল্ক করার মূল কাজটি যদি
بِلَّوْنَ الرَّكُوْةِ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে তারা পরিশুল্ক করার উদ্দেশ্যে
নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয়। এভাবে শুধু সম্পদ দেয়ার মধ্যেই
ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলা হয় لِلرَّكُوْةِ فَاعْلُوْنَ যা বলা হয়েছে
সূরা মুমিনুন-এর ৪ নং আয়াতে, তাহলে এর অর্থ হবে তারা পরিশুল্ক করার কাজ
করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে
সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আআর পরিশুল্কি, চরিত্রের পরিশুল্কি, জীবনের পরিশুল্কি,
অর্থের পরিশুল্কি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুল্ক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। নিজের
জীবনের পরিশুল্কি ছাড়াও চারপাশের জীবনের পরিশুল্কি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় অর্থাৎ
মুমিনরা নিজেদেরকে যেমন পরিশুল্ক করে, তেমন অন্যদেরকেও পরিশুল্ক করার
দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যে যেমন মৌল মানবিক উপাদানের
বিকাশ সাধন করে তেমনি বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন—

— قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى — وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى —

Truly he succeeds that purifies it. And he fails that corrupts it.

“সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং নিজের রবের নাম
স্মরণ করে নামায পড়েছে।” (সূরা আল আলা : ৯-১০)

যাকাত সকল নবীদের দ্বীনে বা জীবন ব্যবস্থায় ফরয ছিল এবং সকল নবীই এর
প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাইলদের
নবীগণও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এ ব্যাপারে গাফেল

হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে যাকাত ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাতের পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

হ্যরত মূসা (আ.) এর জাতির লোকদের হন্দয় ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। ধন-সম্পদের জন্য জীবন দিতেও কৃষ্টাবোধ করত না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা এ মহান সমানিত পয়গাম্বরের প্রার্থনার জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, তোমার উচ্চত যথারীতি যাকাত আদায় করলে আমার রহমত পেতে পারবে। অন্যথায় জেনে রেখ তারা আমার রহমত হতে বশিত হবে এবং আমার আয়াব তাদেরকে বেঞ্চ করবে। হ্যরত মূসা (আ.) এরপরেও বনী ইসরাইলদেরকে বার বার এ সতর্ক করা হয়েছে। সর্বশেষ তাদেরকে সুস্পষ্ট নোটিশ জারি করে দেয়া হলো—

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَفْتَمْ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُ الرَّكَأَةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا لَا كُفَّارٌ عَنْكُمْ سِيَّاتُكُمْ.

And Allah said : I am with you if ye (but) establish regular prayers, pay Zakat believe in my Messengers, honor and assist them, and loan to Allah a beautiful loan, verily I will wipe out from you your evils.

আল্লাহ বললেন, হে বনী ইসরাইল : তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলদের প্রতি ঝীমান আন, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও। তাহলে আমি তোমাদের সাথী এবং তোমাদের দোষ ক্রটিশ্বলো দূর করে দেব অন্যথায় রহমত লাভের কোন আশাই তোমরা করতে পার না।” (সূরা আল মায়েদা : ১২)

একমাত্র দয়াময়, রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের যথার্থতা এখানেই। আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁরই দান-অন্য কোথাও থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে আমরা তা পাই না। তাঁরই ভাগুর থেকে আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু যা কিছু আমরা দেই, তাঁকে নয় বরং আমাদেরই আত্মীয়, ভাই, বন্ধু ও নিজ জাতির লোকদেরকেই দিয়ে থাকি কিংবা নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করি, যার ফল শেষ পর্যন্ত আমরাই পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই মহান দাতার বদান্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি এসকল দান সম্পর্কে বলেন যে, এটা তাঁকে ঝগ দেয়া হয়েছে, এর ফল আমিই তোমাদের দেব, বস্তুত বদান্যতার এ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষেই শোভা পায়, কোন মানুষ এর ধারণাও করতে পারে না।

একজন মুসিন কখনো এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে পারে না। সে আল্লাহর সাথে এ ব্যবসায় লিঙ্গ হয়ে নিজ সম্পদকে যেমন পরিত্ব রাখবে তেমনি আবার নিজেকেও পরিত্ব করবে এবং সে নিজেকে ধর্ষের হাত থেকে রক্ষা করবে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِينَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

And spend of your substance in the cause of Allah, and make not your own hands contribute to (your) destruction.

“আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজের হাতেই নিজেকে ধর্ষের মুখে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করলেই নিজেকে ধর্ষের মুখে নিক্ষেপ করা হয়)।” (সূরা আল বাকারা : ১৯৫)

মুসিন তার লজ্জাহানের হেফায়ত করবে

বিশ্বনবী (স.) বলেছেন- “কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাহানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাহানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।” (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, আহমদ)

লজ্জাহানের হেফায়ত কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকা নয়, নিজের লজ্জাহানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। হ্যরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী (স.) বললেন “তুমি কি জানো না রান দেকে রাখার জিনিস?” কেবল অন্যের সামনে নয় একান্তেও উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

إِيَّاكُمْ وَالَّتَّعَرَىٰ فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ لَا يَفْرَقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَ�يَطِ وَحِينَ يُفْضِي
الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ.

“সাবধান কখনো উলঙ্গ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সস্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা), তোমরা যখন প্রকৃতির ভাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো, তাদের সম্মান করো।” (তিরমিয়ী)

শরীয়তে পুরুষের ন্যায় নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টি সংযমের ব্যাপারে বিধান বিদ্যমান রয়েছে। তারা পুরুষের মতোই ভিন্ন পুরুষদের দেখতে পারবে না। একদা হ্যরত

উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমুনাহ নবী (স.) এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম এসে গেলেন। তখন নবী (স.) উভয় স্ত্রীকে বললেন : তাঁর থেকে পর্দা করো। স্ত্রীস্থ বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল (স.) তিনি কি অঙ্গ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না; রাসূল (স.) তখন বললেন : ‘তোমরা দু’জনও কি অঙ্গ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না?’ (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী)

সুতরাং মুমিন নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে কোরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে পর্দা অবলম্বন করবে। আল্লাহ রাসূল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন-

قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَعْضُوْنَا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيٌ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

وَقُلْ لِلّمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِينَنَ زِيَّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا طَوْيَضَرِبَنِ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جِبْرِيْلِهِنَ.

Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty : that will make for greater purity for them : and Allah is well acquainted with all that they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (ordinarily) appear there of, that they should draw their veils over their bosoms.

“(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাহ্লানসমূহের হেফায়ত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পরিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাহ্লানসমূহের হেফায়ত করে আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।” (সূরা আন নূর : ৩০-৩১)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর একাধিক হাদীস রয়েছে। যেমন-

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ) قَالَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنَّى أَنْ أَصْرَفَ بَصَرَكَ —

হ্যরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাতে যদি কোন মহিলার ওপর দৃষ্টি নিপত্তি হয়, তাহলে কি করতে হবে? রাসূল (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, ‘তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।’” (মুসলিম)

وَعَنْ أَبِنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَزَّزَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ .

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন : “মহিলারা হল পর্দায় থাকার ব্যবস্থা, সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপক্ষে করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সু-সজ্জিত করে দেখায়।” (তিরমিয়ী)

মহিলারা হলো, পেঁয়াজের ন্যায়। পেঁয়াজের খোসা ফেলে দিলে যেমন পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় দুইতিন দিনের মধ্যে এবং তা থেকে দুর্গম্ব বের হতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারা যদি বেপর্দা হয়ে যায় তখন পেঁয়াজের ন্যায় আত্ম-মর্যাদা হারিয়ে সমাজের নিন্দনীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়। যার ফলে সমাজ দৃষ্টিত হয়ে যায়, নেমে আসে অসুস্থ পরিবেশ।

মুসলিম আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে

আমানত শব্দটি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আমানত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াদা, চুক্তি অঙ্গীকার, প্রতিশ্রূতি, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং জাতি ও জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল চুক্তিকে বুঝায়। এক্ষত্রে গরিব-ধনী, ছোট-বড়, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে সকলের চুক্তি রক্ষা করার শুরুত্ব একই রূপ। সে দরিদ্র বলে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলে সে কিছুই করতে পারবে না। তাই তার সাথে চুক্তি বা ওয়াদা রক্ষা না করলেও চলবে, এবং ধারণা করার বিন্দু পরিমাণও সুযোগ নেই।

একজন মুসাফির আপনার কাছে কিছু টাকা আমানত রাখল। আপনার চিন্তা করার সুযোগ নেই যে, সেতো মুসাফির সে আমার কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং

তার আমানত রক্ষা না করলেও চলবে। এরূপ আচরণ যদি আপনি করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। আপনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনকে ডয় করেন না। আপনার মধ্যে ইমান ও দ্বীনদারী বলতে কিছুই নেই। কারণ হলো, যার মধ্যে ওয়াদা ও আমানত ঠিক থাকে না সে আর মুমিনদের কাতারে থাকে না। তার পরিচয় ভিন্ন হয়ে যায়।
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

“যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার ইমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রূতি রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই।” (বায়হাকী)

এই জন্যে বলা হয়, কাউকে যদি চিনতে এবং জানতে হয় তাহলে তার সাথে লেনদেন বা ওয়াদায় আবদ্ধ হও। ওয়াদা রক্ষা করতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দ্বীনদারিতা আছে এবং মুমিন কিনা জানতে চাইলে তার কাছে আমানত রাখ, আমানতের সঠিক জবাব দিতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ইমান রয়েছে তথা সে মুমিন। কিন্তু বিপরীত আচরণ পেলে তাকেও বিপরীতভাবেই বুঝে নিতে হবে। তাকে চিনতে হবে হাদীসের ভাষ্য মতে একজন মুনাফিক বলে, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَ مَنْ كُنْ فِيهِ
كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ حَصْنَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ حَصْنَةٌ مِنْ
النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِمَّ نَحَانَ وَإِذَا حَدَثَ كَذِبٌ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٌ وَإِذَا
خَاصَّمَ فَحَرَّ.

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৪. আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি করে। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিন নিজের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হয়

পরিত্র কোরআনুল কারীমে নিজেদের নামাযে ‘বিনয় ন্ত্র’ আলোচনায় নামায শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনায় নামায শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো নিজেদের নামাযে ‘বিনয়-ন্ত্র’ আলোচনা দ্বারা মূল নামাযকে বুঝানো হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনা দ্বারা পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের কথা বুঝানো হয়েছে।

নামাযসমূহের সংরক্ষণ বা যত্নবান এর মানে হলো- মুমিন নামাযের ওয়াক্ত, নামাযের নিয়ম-কানুন মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখে। অযু ঠিক মতো করে, কখনো যেন বিনা অব্যুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে, সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়ে। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তিসহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বাস্তাহ তার প্রভু আল্লাহ রাবুল আলামীনের কাছে নিবেদন করছে। মনে হচ্ছে একান্ত সাক্ষাতে মনের কথাগুলো সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করছে। আর প্রিয় ব্যক্তিটি তার মনের প্রতিটি কথার উভয় দিক্ষে।

একজন মুমিনকে এমন নামাযী হতে হবে, যে নামাযের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে মনে হবে, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন মনে হবে এবং মালিকের হৃকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহর দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে আলেমুল গায়েব বলে স্মীকার করা, তাঁকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, তাঁর হৃকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা। আল্লাহর হৃকুমগুলো ভাল করে জানার এবং পালন করার মন-মানসিকতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, আমানতদারী হওয়া, সময়ানুবর্তী হওয়া এসব শুণ মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি হবে তখনই যখন সে নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে।

নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হলে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আযান শোনা মাত্রই পার্থিব জীবনের সকল ব্যন্ততা ঘেড়ে ফেলে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে আসতে হবে। যে কাজটি একটি সৈন্যবাহিনীর কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়ায় হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাবটি হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তখন যে যেখানেই থাকে সে সেখান থেকে নির্দিষ্ট স্থানে ছুটে আসে।

প্রিয় পাঠক, সৈন্যদের জন্য এ নিয়ম কেন করা হয়েছে? যাই হোক উভরটা আমিই দেই— দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ নিয়মটা করা হয়েছে। যেমন— এক, যেন প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার অভ্যাস বিদ্যমান থাকে।

দুই, সকল অনুগত সিপাহীদের সমষ্টিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করা যারা সেনাপতির আদেশে একই সময়ে একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যন্ত থাকবে, আর এ অভ্যাসস্থল এজন্য যে, যে কোন মুহূর্তে কোন শক্তি পক্ষের হামলা আসলে যেন সকল সিপাহী একই আওয়ায়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে মোকাবিলা করতে পারে।

অনুরূপভাবে মুমিনদের জন্য আয়ান হলো একটি বিউগল; যার মাধ্যমে মুমিনদের নিকটস্থ মসজিদে দৈনিক পাঁচবার হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয় এবং সকল মুমিন যেন আল্লাহর একটি সৈন্য দলে পরিণত হতে পারে। দৈনিক পাঁচবার আয়ান নামক বিউগলের মাধ্যমে একত্রিত হওয়ার অভ্যাস করানো হয় যেন দুনিয়ার যেই কোন তাগুত শক্তির হামলার মোকাবিলায় এক দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

আর স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার সকল সৈনিক বাহিনীর চাইতে আল্লাহর সৈনিক বাহিনীকে শক্তিশালী হতে হবে। কারণ হল অন্যান্য সৈনিক দলের পক্ষে বহুকাল পরে কখনো কখনো হয়ত যুদ্ধ করতে হয়। নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু আল্লাহর রাবুল আলামীনের সৈনিকদের প্রতিটি মুহূর্তেই শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেক মুহূর্তে সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই জন্যই মুমিনদেরকে দৈনিক পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল' নামক আয়ানের আওয়ায়ে মসজিদের দিকে ছুটে আল্লাহর সামনে মন্তক অবনত করতে হয়, আর একেই বলা হয় নামায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, ব্যক্তি যত পথ হারাই হোক না কেন, যত বিপথগামীই হোক না কেন সে যখনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে তখনই সে সঠিক পথ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ প্রেক্ষাপটে আমি সর্বদা একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। সেটি হলো—

বাগদাদ শহরের একটি মসজিদের পেশ ইমাম, তাঁর স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, ক্রপসী এবং সুন্যনী। স্থানীয় এক দুর্দান্ত মাস্তান যুবক হঠাৎ একদিন ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখে তাঁর প্রতি ভীষণ আসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং এরপর রীতিমতো তাঁকে বিরক্ত করতে থাকে। একদিন ইমাম সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করে বলল, হে সুন্দরী মহিলা, আমি ইতিমধ্যে তোমার প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

মাস্তান যুবকের প্রস্তাব মহিলা নীরবে শুনলেন এবং তয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। রাতে যখন স্বামী ঘরে ফিরলেন, যুবকের প্রস্তাবিত কথাগুলো তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন, ইমাম সাহেব বললেন, তুমি রাজি হয়ে যাও। তবে একটি শর্তে, যদি সে একটানা চল্লিশ দিন আমার মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে এবং এ শর্ত আগে পূরণ করে, তাহলে তুমি বলবে আমি রাজি।

পরের দিন যুবক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার প্রস্তাবের সম্মতি পাব কি?

মহিলা বললেন, একটি শর্তের ভিত্তিতে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি, শর্তটি হচ্ছে কোন বিরতি না দিয়ে একটানা চল্লিশ দিন আমার স্বামীর মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে হবে। তারপর আমার কাছে আসবে।

যুবক বললো, এটা তো অতি সহজ শর্ত। এর চেয়েও কঠিন শর্ত দিলে আমি মেনে নিতাম।

এবার যুবক পাক পবিত্র সুন্দর পোশাক পরিধান করে নামায পড়তে লাগলো। ফজরের পর যোহরের অপেক্ষা করে। যোহরের পর আছুর। এরপর মাগরিব। এরপর এশা কোন বিরতি নেই নামাযে। এভাবে চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল।

অতঃপর এ যুবক ইমাম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে ত্বক করে কেঁদে উঠলো এবং বললো, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি অক্ষকার পথে বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে আলোর পথ দান করেছেন। সুপথ দান করেছেন। আমাকে দয়া করে মাফ করে দিন।

এবার ইমাম সাহেব যুবককে নিয়ে মুনাজাত ধরলেন,

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لُدْنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ.

Our lord, let not our hearts deviate now after thou hast guided us, and grant us mercy from you. Truly you are the granter of Bounties without measure.

“হে আল্লাহ! তায়ালা! সুপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অস্তরকে আর বক্র করে দিও না। আর আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন। কারণ আপনি অসীম করুণার আধার।” (সূরা আল ইমরান : ৮)

সুতরাং সু-পথে আমৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকতে হলে অবশ্যই নামাযের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। যখনই চরিত্রে নামাযের ব্যাপারে অবহেলা অবলোকন হবে তখনই বুঝতে হবে সুপথে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত নেই। তার ঈমানে ধস নেমেছে, এই জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিজের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। যে কাজ করে থাকবে একজন পূর্ণ মুমিন ব্যক্তি। নামাযের সময় হলে মুমিন ব্যক্তি একমাত্র নামায ছাড়া কোন কিছুর মাঝে শান্তি পায়না, পায়না আত্মতৃষ্ণি।

মুমিন ভীত হয়ে যায় আল্লাহর স্মরণে

খোদাভীতি এমন একটি শুণের নাম, মুমিন ইওয়ার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। দুনিয়ার কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি এবং সাফল্য এর মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তি জীবনের সুখ, পারিবারিক জীবনের শান্তি, সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভারসাম্য সব কিছু যেন খোদা ভীতির বেষ্টনীর আওতায় বিদ্যমান। নবী করীম (স.) বলেছেন, ‘তাকওয়াকে’ গ্রহণ কর, তা সমস্ত কল্যাণের উৎস।”

ইসলামে সাদা-কালো, আরাবি-আজমি, ধনী-গরিব এর মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা মৃল্যায়ন হয় না বরং তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হয়। এ ক্ষেত্রে কোরআনুল কারীমের বক্তব্য হলো-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحَبِّيرٍ.

O mankind! we created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes. That ye may know each other (not that ye may despise each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things)

“হে মানবমণ্ডলী : আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী (আদম ও হাওয়া)

থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাইকৃ। নিচয়ই আল্লাহ অধিক জাত এবং সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল হজুরাত : ১৩)

মুমিনকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার কোন কথা, কোন কাজ, কোন আচরণ এবং কোন পদক্ষেপ যেন আল্লাহ তায়ালার পছন্দের বিপরীত না হয়। প্রতিটি কাজে মুমিন মহান আল্লাহকে ডয় করে চলবে এবং এটাই হলো, ঈমানের দাবি। মুসলিম জাহানের খলিফা হ্যরত ওমর (রা.) এক গভীর রাতে মদিনার একটি পথ অতিক্রম করছিলেন জনগণের অবস্থা জানার জন্য। এটি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। পথ চলার মাঝে একটি ঘর থেকে কথাবার্তার কিছু মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন। থমকে দাঁড়ালেন বিশ্ব মুসলিম জাহানের খলিফা হ্যরত ওমর ফারুক (রা.) জানতে চাইলেন কেউ কোনো বিপদে পড়েছে কিনা? কান পেতে শুনতে পেলেন : এক মহিলা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, মা দুধে পানি মিশাও সকাল বেলায় বিক্রি করতে হবে। তাহলে একটু বেশী লাভ করা যাবে। মেয়েটি বললো : মা! আমি দুধে পানি মিশাতে পারব না। কারণ হলো খলিফা ওমর (রা.) আদেশ দিয়েছেন দুধে পানি মিশানো যাবে না।

মা বললো মেয়েটি আমার গিয়ে দেখ, খলিফা ওমর (রা.) জনমের মতো ঘূমাচ্ছেন, সেতো দেখবেও না, শুনবেও না, তাড়াতাড়ি পানি মিশাও।

মেয়েটি বললো : খলিফা ওমর (রা.) দেখছেন না, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয়া যেতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তোমার আমার স্বৃষ্টি আল্লাহ রাবুল আলায়িনের চোখ তো ফাঁকি দেয়া যাবে না। তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। সুতরাং আমি একাজ করতে পারব না।

খলিফা ওমর (রা.) স্বয়ং নিজ কানে মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন কি দিয়ে মেয়েটিকে দুনিয়ার জীবনে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। অবশ্যে অর্ধ পৃথিবীর শাসক হ্যরত ওমর (রা.) নিজ পুত্রের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আর সে মেয়ের ঘরে যে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন ইসলামের পৰ্যওত খলিফা হ্যরত ওমর ইবনুল আবদুল আজিজ (রহ.) সেই মেয়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।

হ্যরত মাগির ইবনে মালিক (রা.) আল্লাহর রাসূল (স.) এর কাছে এসে অনুত্তপ মিশ্রিত কষ্টে বললেন : আমি অবৈধ পছায় যৌনক্রিয়া করেছি, আমার প্রতি

দণ্ডারূপ করুন; রাসূল (স.) তাকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। লোকটি চলে গেলো। মনে কোনো প্রশান্তি পাচ্ছিলো না। পর পর তিনবার রাসূলের নিকট আসলো দুনিয়াতেই শান্তি পাওয়ার জন্য। যখনই সে আল্লাহকে স্মরণ করে তখনই ভীত হয়ে রাসূলের নিকট চলে আসে শান্তি পাওয়ার জন্য এবং তিনবারই রাসূল (স.) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। চতুর্থবার যখন লোকটি আসলো শান্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (স.) তখন জানতে চাইলেন, লোকটি কোনো ধরনের নেশা করেনি? লোকজন বললো ‘না’ লোকটি কোনো নেশা করেনি। রাসূল আবার জানতে চাইলেন লোকটি কোন নেশা করেনি তো? লোকজন বললো ‘না’। লোকটি কোন নেশা করেনি। এরপর লোকটিকে পাথর নিষ্কেপ করে হত্যা করা হলো। রাসূল (স.) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘তোমরা মাগির ইবনে মালিকের জন্য মাগফিরাত কামনা করো। কারণ সে এমন তওবা করেছে যে, তাঁর তাওবা সমস্ত মানুষের মধ্যে বস্টন করে দিলে তাই যথেষ্ট হতো।’

মুমিন সমাজের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, উপরোক্ষিত দু'টি ঘটনা হলো প্রকৃত খোদাইতি, আপনার পিছনে কোন পুলিশ থাকবে না, আইন শৃঙ্খলার কোন সদস্যই আপনার পিছনে থাকবে না। কোনো গোয়েন্দা নজর থাকবে না। এরপরও আপনি এক আল্লাহকে স্মরণে রেখে সকল ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। কেননা আল্লাহর নজরদারিতাকে যদি আপনি ভয় না করেন, আপনি যদি আল্লাহর উপস্থিতিকে উপলক্ষ না করেন, তাহলে কখনই আপনি অপরাধ থেকে বাঁচতে পারবেন না। পৃথিবীর যে কাউকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব কারণ সেও তো আপনার মতো একজন মানুষ। তাই একজন মুমিন সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণে রেখে তাঁর আয়াবকে ভয় করে দিনাতিপাত করে থাকে।

মুমিনের ঈমান আল্লাহর আয়াতের সম্মুখীনে বেড়ে যায়

মুমিনের সামনে যখন আল্লাহর কোনো আয়াত বা হকুম আসে এবং সে তা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয় তখনই তার ঈমান বেড়ে যায়। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ زَادُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

And when they hear His revelations rehearsed, find their faith strengthened.

“আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের (মুমিনদের) সামনে পড়া হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।” (সূরা আল আনফাল : ২)

যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর প্রিয় রাসূলের হেদায়াতের মধ্যে মুমিন এমন কোনো জিনিস দেখে, যা তাঁর ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ, আচার-আচরণ, স্বার্থ, আরাম-আয়েশ, ভালোবাসা ও বস্তুত্ব বিরোধী হয় এবং সে তা মেনে নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হকুম পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে বা নিজের ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করে ফেলে এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয়, তখন মুমিনের ঈমান আরও তরঙ্গাজ্ঞা ও পরিপূর্ণ হয়। আর তখন সৃষ্টি হয়ে যায় আজ্ঞা-সম্মান ও মর্যাদা এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত না করার প্রবণতা।

ব্যক্তি যখন পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যায় তখন সে আয়াতের সম্মুখীন হলে ঈমান তাঁর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যাঁর ফলে সে আরও সম্মানজনক শক্তির অধিকারী হয়ে যায় এবং তাঁর মধ্যে আজ্ঞা-সম্মান পয়দা হয়ে যায়। আর তখন সে শুধুমাত্র এক আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে শিখে।

এক মুশরিক এসেছিল আল্লাহর রাসূলের সামনে একটি ভাঙ্গা মৃত্তি নিয়ে। এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল (স.) এ মৃত্তিটি ছিল আমার খোদা আমি এর ইবাদত করতাম। আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমি একে নিয়ে যেতাম এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এ আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমি তাকে নিয়ে পথ চলছিলাম। পথিমধ্যে আমার প্রাকৃতিক ডাক আসলো। চিন্তা করলাম এত নীচু কাজ করতে গিয়ে খোদাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই আমি রাস্তার পাশে খোদাকে দাঁড় করিয়ে কাজ সারতে চলে গেলাম।

কাজ সেরে এসে দেখলাম খোদার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একদম ভেজা। চিন্তা করলাম খোদার শরীর ভেজা অবশ্যই বরকতের পানি হবে, তাই চাটা আরম্ভ করলাম। চাটতে গিয়ে দেখি যেন টক টক এবং ঝাঁঝালো গন্ধ। ভাবলাম যদি বরকতের পানি হয় তাহলে এমন গন্ধ হবে কেন? চতুর্দিকে তাকাতে লাগলাম, তাকাতে গিয়ে দেখলাম রাস্তার পাশে একটি কুকুর দাঁড়ানো। কুকুরটির লিঙ্গ থেকে পানি টপকাচ্ছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না এ কোন বরকতের পানি। হজুর মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। খোদার সামনে গিয়ে পা দু'খানা ধরে একটা আছাড় দিলাম আর বললাম তুমি কি খোদা নাকি আস্ত একটা হৃদা! তুমি

কুকুরের প্রস্তাৱ হতে নিজেকে বাঁচাতে পাৱলে না আৱ আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে কিভাবে?

নবীজি হেসে দিলেন। হাদীসে এসেছে এই প্ৰথম যে, হাসতে গিয়ে হজুৱ (স.) এৱে দণ্ড মোবাৱক বিকশিত হলো। রাসূল (স.) বললেন : তোমাৱ এই ভাঙা মূৰ্তি নিয়ে এখন কেন এসেছ? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহি (স.) আজ আমি নিজেকে বুৰাতে পেৱেছি এত দিন আমি ভুলে ছিলাম, যেগুলোৱাৰ সামনে এতদিন মাথা নত কৰেছি এগুলো আসলে কিছুই নয়, আপনি আমাকে আজ আলোৱ পথ দেখিয়ে দিন। হজুৱ (স.) বললেন তাহলে পড় আমাৱ সাথে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

মুমিন এক আল্লাহৰ ওপৰৱই ভৱসা কৰে

মুমিনেৱ অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে সে এক আল্লাহৰ ওপৰ ভৱসা কৰবে, পৃথিবীৱ কোন শক্তিকেই পৱোয়া কৰবে না, কাৱো অগ্ৰিচক্ষুকে সে ভয় পাৰে না। যালিম শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যালিম শক্তিৰ সামনেই সে কথা বলতে দ্বিধা কৰবে না। আল্লাহ ব্যক্তীত অন্য কোন শক্তি তথা রাজা-বাদশা, শাসক গোষ্ঠী, ধৰ্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজেৱ কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিবৰ্গেৱ সামনে মুমিন মাথা নত কৰতে জানবে না।

আমৱা যদি বিশ্বনবী মুহাম্মাদুৱ রাসূলুল্লাহ (স.) এৱে সময়েৱ মুমিনদেৱ দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাৰ যে, ঈমানী চেতনা তাঁদেৱ হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালার মহেৰ ও মাহাত্ম্য দ্বাৰা পৱিপূৰ্ণ কৰে দিয়েছিল জাগতিক সৌন্দৰ্য ও আকৰ্ষণ, পৃথিবীতে চিন্তভোলা দৃশ্য ও প্ৰতাৱণাকাৰী বন্ধসমূহ এবং সাজ-সৱজামেৱ প্ৰদৰ্শনীৰ কোনো মূল্যই তাদেৱ দৃষ্টিতে ছিলো না। তাৱা যখন বিশ-শাসক গোষ্ঠীৰ জঁকজমক ও প্ৰভাৱ-প্ৰতিপন্থিৰ এবং তাদেৱ দৱৰাবাৱেৱ সাজ-সজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰতেন, তাৱা দেখতেন এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সৱজাম নিয়ে পৱয় তুষ্ট হয়েছে কিষ্ট তাঁদেৱ কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ যেন মাটিৰ বানানো পুতুল-যাদেৱকে মূল্যবান পোশাকে আৰৃত কৰে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদৱৰাবাৱে যাতায়াতকালে অজ্ঞ লোকগুলো সে সাজানো মনিবৰূপি মৃত্তিগুলোৱাৰ সামনে মাথা নত কৱতো। রাজদৱৰাবাৱে যাতায়াতকাৰী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাকে সিজদা কৱত তখন রাজদৱৰাবাৱে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পৱিস্থিতিতে হয়ৱত জাফৱ ইবনে আবু তালিব (রা.)

আপোষহীন কষ্টে সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে বললেন : “আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহর রাবুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না ।”

এমন পরিস্থিতিতে এমন বিপুরী ঘোষণা দিতে পারে একমাত্র মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী মুমিন ব্যক্তিরাই, কারণ সে বিশ্বাস করে, *خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ* ‘ভালো হোক মন হোক সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে’। আল্লাহর উপর যিনি নির্ভর করতে পারেন পূর্ণভাবে তিনি কখনো নিরাশ হন না, হতাশ হন না, পিছু হটেন না। আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য হতে তাঁকে এমনভাবে সাহায্য করে থাকেন যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। অবশেষে তিনি শুধু আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাই করতে জানেন।

হ্যরত আযুব (আ.) এর ১৮টি বছরের জীবনের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারবো আল্লাহর ওপর ভরসা কাকে বলে। হ্যরত আযুব (আ.) দীর্ঘ আঠারোটি বছর রোগে-শোকে দিনাতিপাত করছিলেন। সকল অর্থ-সম্পদ হারিয়ে ফেললেন। পুরো দেহে পঁচে পোকা ধরে ফেললো। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী আজীয়-স্বজন সবাই তাঁকে হেঢ়ে চলে গেলো। আল্লাহ ছাড়া তাঁর এখন আর কেউ নেই। তবুও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মহান আল্লাহর ওপর থেকে ভরসা হারালেন না। শুধু কেবল যখনই জিহ্বাতেও পোকা ধরে ফেললো, তখন শুধু এতটুকুই বললেন যা আল্লাহ তায়ালা পরিত্র কোরআনুল কারীমে রেকর্ড করে দিয়েছেন-

إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ
مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مَنْ عِنْدَنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ.

When cried to the lord ‘Truly distress has seized me, but thou art the most merciful of those that are Merciful. So we listened to him : We removed the distress that was on him, and we restored his people to him, and doubled their number, as a Grace from ourselves, and a thing for commemoration, for all who serve us.

“(শ্বরণ করো) যখন সে তার রবকে ডাকলো, ‘আমি রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি করণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করণাকারী। আমি তার দোয়া করুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার

পরিবার-পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদতকারীদের জন্য”। (সূরা আল আব্রিয়া : ৮৩-৮৪)

অবশ্যে আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আয়ুবের (আ.) সকল ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সুস্থিতা ফিরিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করুন সম্মানিত পাঠক, হ্যরত আয়ুব (আ.) বেশী কিছু বললেন না। শুধু বলেছেন ‘আমি অসুস্থ আর তুমি রহমানুর রাহীম। অমনিতেই আয়ুবের ডাক আল্লাহর আরশে আয়ীমে পৌছে গেলো। একজন ভিক্ষুক ঈদের দিনে ঈদগাহের গেটে দাঁড়িয়ে বললো : ‘হায়রে আজ ঈদের দিন সবাই কতোই না আনন্দ করছে আর আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; একথার সাথে সাথে দেখা গেলো অন্যান্য সকল ভিক্ষুকের চাইতে সে ভিক্ষুকই বেশী টাকা পেলো। ভিক্ষুকটি কিন্তু বেশী কিছুই বলেনি। যে কোন কথার বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলী যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে কথা বেশী বলতে হয় না। অল্প কথাতেই আশা পূরণ হয়ে যায়। হ্যরত আয়ুব (আ.) আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে যখন এতটুকুন কথা বললেন যে, আমি অসুস্থ আর তুমি রহমানুর রাহীম। আর অমনিতেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা করুল করলেন।

সুতরাং মুমিন যতই দেখুক না কেন যে, চতুর্দিক থেকে অঙ্ককার অমানিশা নেমে আসছে, তাণ্ডের দীর্ঘ ছঞ্চার, প্রতারকদের কঠিন বড়বন্ধ, চতুর্দিকে অন্ত্রের ঝনবানানি এসব কিছুর আড়ালে সে দেখতে পাবে আশার আলো। সে বিশ্বাস এবং আশা করবে এ সকল অঙ্ককার কেটে গিয়ে তোর হবেই এবং আলোকময় লাল সূর্য উদিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই তাণ্ডের আঘাতে নির্যাতিত হয়েছেন। কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্ত পার করেছেন আর উভরে নির্যাতনকারীদের বলেছিলেন তোমরা যত ইচ্ছা নির্যাতন কর, আমরাতো কেবল এক আল্লাহর উপরই ভরসা করবো।

মুমিন নামায কায়েম করে

যেই কোন মানুষ পবিত্র কোরআনুল কারীম শুধুমাত্র মেনে নিয়ে বসে থাকলে সে কখনো কোরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং এর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে তার আনুগত্যও করতে হবে। কোরআনুল কারীমের বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী বহিঃপ্রকাশ হলো নামায। ব্যক্তি যখনই ঈমান আনে

সংগে সংগেই যে কাজটি তার উপর ফরয হয় তা হলো নামায। মুয়ায়খিন দৈনিক পাঁচবার এই আনুগত্যের জন্য আহ্বান করে। যখনই ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বসে থাকে, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি আনুগত্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়লো। একথাটি জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, নামায কায়েম করা ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক একটি পরিভাষা। এর অর্থ কেবল একাকী নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাই এর অর্থ। যদি কোথাও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নামায আদায় করে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরয়টি আদায় করার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যাবে না এবং একাকী নামায আদায়কারী অথবা নামাযে অবহেলাকারী ব্যক্তিরা মুমিন তাও বলা যাবে না। কেননা, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে সে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ রাকুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ。 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔

Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts we have given them for sustenance: Such in truth are the Believers.

“তারা (মুমিনরা) নামায কায়েম করে এবং যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তা থেকে আমার পথে দান করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন।” (সূরা আল আনফাল : ৩-৮)

মুমিন যখন যে গভিতে থাকে তখন সে গভিতে নামায প্রতিষ্ঠা করবে অর্থাৎ শুধু পরিবারে ক্ষমতা থাকলে পরিবারে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, সমাজে ক্ষমতা থাকলে সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। সর্বোপরি মুমিন ব্যক্তি নিজে ব্যক্তি জীবনে নামাযে সক্রিয় থেকে অন্যদেরও নামাযে অভ্যন্ত করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাকুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ করবে।

দুনিয়ার কারাগারে কেউ প্রবেশ করলে তাকে অন্যরা জিজ্ঞেস করে তুমি কেন কারাগারে এলে? অনুরূপভাবে পরকালে জাহান্নামে নিপত্তিত হওয়া ব্যক্তিরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কেন এ ভয়াবহ আঘাতের স্থানে এলে? বেনামায়ী বলবে তার নামায না পড়াই জাহান্নামের প্রবেশের কারণ। আল্লাহ রাকুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন—

يَسْأَلُونَ — عَنِ الْمُجْرِمِينَ — مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ — قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصْلِحِينَ — وَلَمْ نَكُ نُطِعْمُ الْمِسْكِينَ —

They will question each other- And of the Sinners what led you into Hell fire? They will say we were not of those who prayed, Nor were we of those who feed the indigent.

“সে দিন তারা পরম্পরকে জিজেস করবে তোমদেরকে আজ কি কারণে জাহানামের ভয়াবহ আশাবে উপনীত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং (ক্ষুধার্ত ও) অভয়ীদের খাবার দিতাম না।” (সূরা আল মুন্দাসির : ৪০-৪৪)

একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সকল ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে কাজটি প্রথমেই করতে হবে সেটি হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা। নামাযই পারবে একটা কিশোর থেকে বৃক্ষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষকে অন্যায়-অপরাধ থেকে দূরে রাখতে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন-

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

Recite what is sent of the Book by inspiration to thee, and establish regular prayer, for prayer restrains from shameful and evil deeds.

“এ কিতাব তিলাওয়াত করুন, যা অহীর সাহায্যে আপনার নিকট অবর্তীর্ণ করা হয়েছে, আর নামায কায়েম করুন নিঃসন্দেহে নামায অঙ্গীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আল আনকাবৃত : ৪৫)

এ প্রসঙ্গে বিখ্নবী (স.) বলেছেন-

হযরত আবী দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স.) আমাকে অসিয়ত করেছেন, “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক হ্যাপন করবে না, যদিও তোমাকে কেউ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে অথবা জালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায ত্যাগ করবে না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে আল্লাহ তায়ালার সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যে দায়িত্ব

ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। মদ পান করবে না কারণ মদ সকল
নিক্ষেপ পাপের চাবি।” (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর রাসূল (স.) যখন জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌছলেন, কখনো ছঁশ,
কখনো বেছঁশ অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। ‘নামায়ের সময় হলে সাহাবারা (রা.)
মসজিদে বসে বসে প্রিয় নবীজীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একপর্যায়ে উপস্থিত
সকল সাহাবীদের পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা.) নামায়ের ইমামতি শুরু
করলেন। আল্লাহর রাসূলের (স.) যখন ছঁশ এলো তখন হযরত আয়েশাকে
বললেন : এখন কোন সময়? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : নামায়ের সময়
হয়েছে, আমার বাবার ইমামতিতে সকল সাহাবী নামাযে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বনবী
(স.) বললেন : আয়েশা আমার মাথাটি একটু উঁচু করে ধর, আমি একটু নামায়ের
দৃশ্যটা দেখি।

হযরত আয়েশা বিশ্বনবীর মাথাটা উঁচু করে ধরলেন। মৃত্যু পদযাত্রি পৃথিবীর সেরা
মানুষ রাহমাতুল্লিল আলামীন নামায়ের জামায়াতের দৃশ্য অবলোকন করলেন।
দেখার পর হযরত আয়েশাকে বললেন : এবার মাথাটি নিচে রাখ। হযরত
আয়েশা (রা.) নিজ উরুর উপর রাসূলের (স.) মাথা রাখলেন। রাখার পর
দেখলেন নবীজীর দুঁচোখের কোণা দিয়ে পানি পড়ছে। হযরত আয়েশা (রা.)
কান্নার রহস্য জানতে চাইলে বিশ্বনবী বললেন, আয়েশারে এটি কোনো দুঃখের
পানি নয় বরং এটি হলো তৃণির পানি।

সাহাবীদেরকে নিয়ে যে নামায়ের জামায়াতের জন্য আমি যুক্ত করেছি, তায়েফের
ময়দানে রভাক হয়েছি, উহুদের ময়দানে আমাকে দাঁত হারাতে হয়েছে, সে
জামায়াত দেখে আমি আজ বড়ই তৃণি পেয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাস এসেছে
কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতেরা জামায়াত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

মুমিন আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে দান করে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মুনাফিকুন এ ইরশাদ করেছেন-

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ كُمُ الْمَوْتُ.

And spend something (in charity) out of the substance which
we have bestowed on you before Death should come to any of
you. and he should say.

“আমি তোমাদের যে রিয়িক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমরা তা থেকে খরচ কর।” (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

মৃত্যুর আলামত যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আর কারো সাধ্য থাকে না যে, কায়া নামায, রোয়া ও হজ আদায় করে নিবে। আর ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা সামনে উপস্থিতি থাকে, আর সে বুঝে যে, এখন তার এ ধন-সম্পদ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই সে আর্থিক শারীরিক ইবাদতের দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরণের মুহূর্তে বলে এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ সম্পদ অমুক কাজে লাগাও। কারণ একটু পরেই এ বিশাল সম্পদের কিছুই তার কাজে লাগবে না। শধু অতটুকু ছাড়া যা তাকে বিদায় দিতে প্রয়োজন হবে। ক্ষয়ার কোম্পানীর মালিক মি. স্যামসন চৌধুরী পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত হলো মি. স্যামসন চৌধুরীকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে যা কিছু ব্যবহৃত হবে সবই সর্বোচ্চ দার্মী জিনিস ব্যবহার করা হবে। ব্যবহার করা হলো সর্বোচ্চ দার্মী জিনিস। হিসাব করা হলো, কত টাকা খরচ করা হলো, দেখা গেলো মাত্র চার হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (স.) এর নিকট আরজ করলো, কোন দানে আল্লাহ তায়ালা বেশী খুশি হন? তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বললেন : “যে সাদাকা বা দান সুস্থ অবস্থায় এবং গরীব হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকার অবস্থায় করা হয়।” নবী করীম (স.) আরো বললেন : “আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করো না, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং তুমি মরতে থাকো। আর বলো এই পরিমাণ অর্থ এই ব্যক্তিকে দাও, এই পরিমাণ সম্পদ ঐ কাজে লাগাও। (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের ন্যাচার প্রচুর ধন-সম্পদের আশায় কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ব্যস্ত থাকে এবং যার ফলে সে আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

— حَتَّىٰ زُرْشُمُ الْمَقَابِرِ —

The mutual rivalry for piling up diverts you— Until visit the graves.

“প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এমনভাবে গাফেল করে রাখে যে, তোমরা কবর পর্যন্ত পৌছে যাও।” (সূরা আত তাকসুর : ১-২)

সম্পদ অর্জনে ইসলামের কোনো বাধা নেই যদি নিয়মতাত্ত্বিকভাবে তা অর্জন করা যায়। তবে পাশাপাশি শধু অর্জনের পিছনেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলে চলবে না বরং

আল্লাহর পথে বর্জনেরও চিন্তা-চেতনা থাকতে হবে। অর্জিত প্রাচুর্যের গর্বে এবং আরো অধিক অর্জনের প্রতিযোগিতায় যারা ডুবে আছে যে, একদিন এসব সম্পদ ত্যাগ করে সংকীর্ণ একটা গর্জে আশ্রয় নিতে হবে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, শনো! প্রতিযোগিতা ও অহংকার এবার থামাও, জাগো এবং চোখ মেলে তাকাও : অতিরিক্ত অর্জনের নেশা ও হাত গুটিয়ে রাখা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে। কবরের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের এ অবস্থাই চলতে থাকবে।

একজন মুমিন সর্বদা এর বিপরীত হবে। সে সঠিক পছায় সম্পদ আয়ের পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর পথে ব্যয় করাতেই পরিভৃত থাকবে। সে বিশ্বাসী হবে নিজে যা খায় তা শেষ হয়ে যায় আর অন্যকে যা খাওয়ানো হয় তা থেকে যায়। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাইয়েদ কামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ জাফরী বলেছিলেন যে, ‘আমি এমন এক ব্যক্তি যার ওপর যাকাত ফরয হয় না; আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর মুখেই তাঁর এমন বক্তব্য শনে, কারণ আমি মোটামুটিভাবে তাঁর আয়ের উৎসগুলো জানি। এর একমাত্র কারণ হলো তিনি শুধু সম্পদ আয়ই করেননা বরং আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ও করেন আল্লাহর পথে। বক্তৃত এটি হলো একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

মুমিন রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে

আল্লাহ রাবুল আলামীন পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেন-

— وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ —

Those who believe in the Signs of their Lord.

“আর যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে (তারা মুমিন)।”
(সূরা মুমিনুন : ৫৮)

এখানে আয়াত বলে দু’ধরনের আয়াতকে বুঝানো হয়েছে। এক. যেসব আয়াতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবীগণ অহীর মাধ্যমে লাভ করে পেশ করেছেন, দুই. যেসব আয়াতগুলো মানুষের নিজের মনের বা বিবেকের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অহীর আয়াতের প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতা স্বীকৃতি দেয়া এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব বিবেকের আয়াতের তথা নির্দর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে সেসব সত্যকে আল্লাহর নির্দর্শনা বলে স্বীকার করা।

মোটকথা হলো রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর

সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে তার প্রতি ঈমান আনাই প্রমাণ করে, একজন মুমিন সকল ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে একবার স্বীকৃতি দিবে যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায় এবং যা কিছু দেখা যায় না- সবই মহান আল্লাহ
রাবুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এসব কিছু পরিচালনা করেন।

আল্লাহ রাবুল আলামীনকে এ পৃথিবীর কেউ দেখতে পারেনি, দেখতে পাচ্ছে না এবং কখনো দেখতে পারবে না। হ্যরত মুসা (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন আয় আল্লাহ তায়ালা আমি আপনাকে একটু দেখতে চাই, আল্লাহ রাবুল আলামীন বলেছিলেন : لَنْ تَرَأَنِي (তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না)। অনর্থক প্রার্থনা করিওন্না বরং কাজ করতে থাক এবং আমার শুণাবলীর দ্বারা, কার্যাবলীর দ্বারা নিদর্শনাবলীর দ্বারা আমার পরিচয় লাভ করো।

একজন মানুষ যদি তার নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যেমন- শ্বাসতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, মস্তিষ্ক, ফিংগার প্রিন্ট, ডিএনএ, জিহ্বা ও তার আবাদন, মানবকোষ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করে আর চিন্তা করে এগুলোর কার্যক্রম নিয়ে, তাহলে সে অনায়াসেই বলে উঠবে- অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন যিনি এসব কিছু স্থাপন করেছেন। কোন গ্রাম্য লোক-বেদুইন, পড়া-লেখা জানেনা, সে যদি কোন বন-জঙ্গল অতিক্রম করে আর সে যদি দেখে কোন জায়গায় ছাগলের লাদি পড়ে আছে তখন সে অনায়াসেই বুঝতে পারে এখানে অবশ্যই ছাগল এসেছিল। কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখলে সে বুঝতে পারে যে, এখানে মানুষ এসেছিল। তাহলে ঐ মহা আকাশ, বির্তুর্ণ যমীন, সীমাহীন গভীর সমুদ্র, গাছ-পালা তরঙ্গতা, পাহাড়-ঝর্ণা, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি দেখে জ্ঞানবানরা কি বিখ্যাস করবে না যে, একজন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীন আছেন যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন?

মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য সৃষ্টি জগতের সর্বত্ত্বে অগণিত আয়াত বা নির্দশন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলামীন। তা দেখে কেউ আল্লাহকে খুঁজে পাবে আবার কেউ মূর্খতাবশত অবীকার করবে। আল্লাহ রাবুল ইঞ্জত ওয়া জালাল পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.

We showed him the way whether he be grateful or ungrateful.

“আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকর গোজার হবে নয়তো
হবে কুকুরের পথ অনুসরণকারী।” (সূরা আদ দাহর : ৩)

আল্লাহর রাস্তুল আলামীনকে খুঁজে পাওয়ার মতো অসংখ্য জিনিস আমাদের চার
পাশে বিরাজমান। তা প্রত্যক্ষ করার জন্য শুধু একটি আলাদা চক্ষুর প্রয়োজন। যে
চক্ষুর নাম হলো অঙ্গের বা হৃদয়। অঙ্গরটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে অনায়াসেই
আল্লাহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষ আল্লাহকে খুঁজে পাবে, আর
যদি অঙ্গের নামক চক্ষুটি অসুস্থ বা অঙ্ক হয়ে থাকে তাহলে কখনোই আল্লাহর
অঙ্গিত্ব খুঁজে পাবে না। এজনই শিল্প তার কোকিল কঠে গেয়ে যায়-

তুমি রহমান- তুমি মেহেরবান,
অঙ্ক গাহে না শুধু তোমার শুণগান।

মুসিন রবের সাথে কাউকে শরীক করে না

যুলুম হলো ইনসাফের বা আদলের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন। এ সৃষ্টিতে তাঁর কেউ শরীক নেই। অতএব ইনসাফ হলো এককভাবে
তাঁরই ইবাদত করা। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হবে সবচে বড়
যুলুম। বলতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চম নীতি হলো তাওহীদ আর সবচেয়ে
নিকৃষ্ট কাজ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যা পৃথিবীর সবচেয়ে
জন্মন্যতম অধিকার হরণ এবং যুলুম। আল্লাহর রাস্তুল আলামীন বলেন-

لَا تُشْرِكُ بِاللهِ مَنْ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

Join not in worship (others) with Allah: for false wordhip is
indeed the highest wrong-doing.

“আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কেননা, শিরক হলো সবচেয়ে বড়
(জন্মন্যতম) যুলুম।” (সূরা লোকমান : ১৩)

সন্তান পিতা-মাতার সাথে অনেক ধরনের অপরাধই করে থাকে, কথা ওনে না,
সম্পদ নষ্ট করে, দুর্যোগের করে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত জীবন গড়ে।
এরপরেও ক্ষমা চাইলে পিতা-মাতা সন্তানকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যখনই সন্তান
তার পিতা-মাতার সন্তান ওপর আঘাত করে তখন কিন্তু আর ক্ষমার দরজা খোলা
রাখেন না এবং ক্ষমা করে না। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর সাথে অনেক ধরনের
পাপ করে থাকে। নামায পড়ে না, রোয়া রাখে না, পর্দা করে না, তাঁর বিধান মত

পরিবার/সমাজ/বাস্ত্র পরিচালনা করে না, বিচারালয় চালায় না, চুরি করে, ডাকাতি করে, মিথ্যা কথা বলে। এই ছাড়াও অসংখ্য অপরাধ করে থাকে, কিন্তু এই সকল বড় বড় অপরাধ করে যদি কবরে ছলে যায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে অন্য কোন পুণ্য কাজের বিনিময়ে তাঁর রহমতে মাপ করে দিতে পারেন বা এই সকল অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত দান করতে পারেন। কিন্তু শিরক হলো এমন এক জঘন্য অপরাধ যা আল্লাহ রাকবুল আলামীন কোনো মতেই ক্ষমা করবেন না এবং শিরককারীকে হ্যায়ী জীবনের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। পরিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يُشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا.

Allah for giveth not that partners should be set up with Him but He forgiveth anything else, to whom he pleaseth, to set up partners with Allah is to Devise a sin most heinous indeed.

“আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।” (সূরা আন নিসা : ৪৮)

এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শিরক করবে না এবং বাদবাকি গুনাহ করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের গুনাহকে তারা মামুলি গুনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ। এমনকি অন্য সমস্ত গুনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এই গুনাহটি মাফ করা হবে না। ইহুদী আলেমরা শরীয়তের ছেট ছেট বিধি-নিষেধ পালনের ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছেট খাটো বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই-বাচাইয়ে অতিবাহিত হতো, তাদের ফকিহগণ এই খুটি-নাটি বিধানগুলো বের করে ছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছেট গুনাহ। তাই এই গুনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোনো প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুশরিক কার্যকলাপ থেকে বাঁচার জন্য কোনো উদ্যোগও তারা নেননি। মুশরিকদের সাথে বক্সতু এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হয়নি।

চলনে-শয়নে, গ্রহণে-বর্জনে, বলনে-নয়নে, সকল ছানেই একমাত্র আল্লাহর তাওহীদকে লালন করতে হবে। দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ তায়ালা। তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে। আনুগত্যের মন্তব্য একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। ইবাদত-বন্দেগি, জীবন-মরণ সকল কিছু শুধুমাত্র-কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে, এখানে কাউকে বা কোন কিছুকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَتُسْكِنِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Say : Truly, my prayer and my services of sacrifice, my life and my death, are (all) for Allah, the Cherisher of the worlds.

“বল আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।” (সূরা আল আনআম : ১৬২)

এই ক্ষেত্রে মুমিন কাউকে অংশীদারিত্ব করবে না। লক্ষ্য ছির করার ক্ষেত্রে মুমিন কোনো দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে না। কেননা, সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহরই দাস হিসেবে বিশ্বাস করে তাই তারই নির্দেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশও অনুরূপ-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

Serve Allah, and join not any partners with him.

“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগি করো তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।” (সূরা আল নিসা : ৩৬)

যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো বিষয়কে শরীক করলো তো সে সংগে সংগে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তার সাথেই তার সম্পর্ক গড়ে উঠে যাকে সে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করলো। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أَغْنِيُ الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাস.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা

বলেন : আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত-পরিত্র (আমার কোনো শরীক নেই), যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো, যাতে আমার সাথে আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে। আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, তার সম্পর্ক তার সাথে, যাকে সে শরীক করেছে।” (মুসলিম)

আগুন যেমন লাকড়িকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তেমনি শিরক মানুষের পুণ্য কাজকে জ্বালিয়ে দেয়। এই শিরকের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে যা না জানার কারণেও আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে। শিরকের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

শিরক প্রথমত চার প্রকার। যথা :

১. *الشَّرْكُ فِي الذَّاتِ* (আল্লাহর স্বত্ত্বার ক্ষেত্রে শিরক) :

আল্লাহ ব্যক্তিত আরো ইলাহ, রব আছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর স্বত্ত্বান, বিবি আছে বলে আকীদা পোষণ করা, আল্লাহর স্বত্ত্বার ক্ষেত্রে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ.

Say : He is Allah the one, Allah, the Eternal, Absolute. He begetteth not, nor is He begotten. And there is none like unto Him.

“বল, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।” (সূরা আল ইখলাছ : ১-৮)

২. *الشَّرْكُ فِي الرِّبُوبِيَّةِ* (আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক) :

সৃষ্টি করা, রিয়ক দেয়া, জীবন মৃত্যু দেয়া, রোগ মুক্ত করা, মান সম্মান দেয়া, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন দেয়া, আসমান যদীন পরিচালনা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাউকে সম্পৃক্ত মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ.

Say : Do ye see what it is ye invoke besides Allah? Show me what it is they have created on earth, or have they a share in the heavens?

“বল তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? (সূরা আল আহকাফ : ৪)

৩. **الشَّرْكُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ** (ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক) :

আল্লাহ তায়ালার নাম হলো দু'প্রকার। সন্তাগত ও শুণবাচক নাম। সন্তাগত নাম হল আল্লাহ (الله) কোন মাখলুকের নাম আল্লাহ রাখা হলে তা হবে সন্তাগত নামে শিরক। এমনিভাবে আল্লাহর নামে মূর্তির নাম রাখা, (যেমন : ইলাহ থেকে লাত, আরীয থেকে উয়া, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি নামকরণ করা আল্লাহর শুণবাচক নামের সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

৪. **الشَّرْكُ فِي الْأَلْوَهِيَّةِ** (ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক)

আইয়ামে জাহেলিয়াতে এ শিরকই বেশী প্রচলিত ছিল। আল্লাহ রাকুন আলামীন নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলতঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ এর প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শিরক ফিল উলুহিয়াহ-কে নিষেধ করার জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبِرُوا الطَّاغُوتَ.

For we assuredly sent amongst every people a Messenger, (will he the command), 'serve Allah. and eschew Evil'

“আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।” (সূরা আন নাহল : ৩৬)

যেমন-
ক. **الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ** (বড় ধরনের শিরক)

নিম্নলিখিত কাজগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

১. কবরকে মসজিদ অর্থাৎ সাজদার জায়গা বানানো।
২. কবরকে সামনে রেখে ইবাদত করা।
৩. কবরে বাতি জ্বালানো।
৪. কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো, কবরের উপর চাঁদর জড়ানো, কবরকে কেন্দ্র করে লোক জমানো ইত্যাদি।

৫. কোন গাছ, পাথর, স্থান, কবর ইত্যাদি ধরনের কোন কিছুর ঘারা বরকত নেয়া ।
৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যে কোন জন্ম যবেহ করা ।
৭. আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাজার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোন কিছু পেশ করা ।
৮. গায়রম্ভাহর নামে মান্ত করা ।
৯. বিপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রম্ভাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা ।
১০. বালা-মুসীবত হতে নিষ্ঠতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা,
১১. যাদু, গণনায় বিশ্বাস করা ।
১২. গায়রম্ভাহর নামে শপথ করা ।
১৩. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা ।
১৪. নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা ।
- খ. *الشُّرُكُ فِي الْأَصْغَرِ* (ছোট ধরনের শিরক)

নিম্নলিখিত কাজগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

১. লোক দেখানো কোনো কাজ করা ।
২. সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা ।
৩. আমলের ঘারা দুনিয়া লাভ করা উদ্দেশ্য হওয়া ।
৪. কোন কথায় আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে শরীক করা ।
৫. ‘যদি’ শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা । যেমন কেউ বললো- যদি অমৃক না থাকত তাহলে অমৃক আমাকে মেরে ফেলত ।

মুমিন আল্লাহর যমীনে ন্যৰ্ত্তভাবে চলে

একজন সত্যিকার মুমিন কখনো অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না । বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর ন্যায় চলে না । বরং মুমিনের চালচলন হবে একজন অদ্র, মার্জিত ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো । তবে ন্যৰ্ত্তভাবে চলার মানে দুর্বল ও রোগীর মতো চলা নয় এবং নিজের আল্লাহভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের

কৃত্রিম চলার ভঙ্গী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। হ্যরাত ওমর (রা.) এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বললো ‘না’ হ্যরাত ওমর (রা.) ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ‘শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো! বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের মুমিন বান্দাগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ন্যূনতা ও অন্ততা বজায় রেখে চলা ফেরা করবে। আল্লাহর বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا.

And the servants of (Allah) Most Gracious are those who walk on the earth in humility.

“রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে ন্যূনতাবে চলে।” (সূরা আল ফুরকান : ৬৩)
অন্যত্র আল্লাহর রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاتٍ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.

Nor walk on the earth with insolence for thou canst not rend the earth asunder, nor reach the mountains in height.

“যদীনে দষ্টভাবে চলো না। তুমি না যদীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।” (সূরা বনী ইসরাইল : ৩৭)

কোরআন আরো বলছে-

وَاقْصِدْ فِي مَسْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

And be moderate in thy pace and lowerthy voice.

“নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো।”
(সূরা লোকমান : ১৯)

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমনকি শুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে চলার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভঙ্গির নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মর্যাদাবান সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র দ্বীন হীনের চলা, একজন খোদাতীরুল ব্যক্তির চলা আর একজন গুণ্ডা ও

বদমায়েশের চলা, একজন বৈরাচারী ও যালেমের চলা, একজন অহংকারীর চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরপর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

“রাস্ল (স.) এর চলা ফেরায় গাণ্ডীর্য, আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হতো। দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলতেন। অলসভাবে পা ঘসে ঘসে চলতেন না। চলার সময় দেহ থাকতো গুটানো। প্রয়োজন নাহলে ডানে বামে না তাকিয়ে পথ চলতেন। সামনের দিকে সতেজ পা তুলতেন। চলার সময় শরীর কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। মনে হতো যেন ওপর হতে নিচে নামছেন। হিন্দ বিন আবি হানার ভাষায়, তাঁর চলা দেখে মনে হতো পৃথিবী তাঁর চলার সাথে সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিচে। কখনো দ্রুত চললে পা দূরে দূরে রাখতেন। তবে সাধারণত মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু হ্যরত আবু হৱায়রার ভাষায়, আমাদের পক্ষে তাঁর সাথে চলাই কষ্টকর হতো। তাঁর চলার ধরন ছিল সূরা লুকমানের ‘যমীনের ওপর দিয়ে দস্তভরে চলোনা’ এই নির্দেশটির বাস্তব প্রতিফলন।” (মানবতার বঙ্গ মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) পৃষ্ঠা : ৭৯)

আমরা জানি, বড়ী করার অহমিকা যদি মানব দেহে থেকে থাকে তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। ব্যক্তির চাল-চলনের রং টৎ তার অহংকারের স্বরূপটি তুলে ধরে। ধন দৌলত, ক্ষমতা কর্তৃত, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির বাস্তব রূপ ব্যক্তির চাল চলনে ফুটিয়ে উঠে, পক্ষান্তরে চাল চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোনো না কোনো দৃশ্যণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। এজন্যই হ্যরত লুকমান (আ.) তাঁর প্রিয় সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন- **وَأَقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ**

(নিজের চলনে ভারসাম্য আনো) অর্থাৎ, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল ও যুক্তিসঙ্গত ভদ্র লোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোনো অহংকার ও দস্ত এবং কোনো দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমায়াল্লাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা হ্যরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। হ্যরত আয়েশা (রা.) পথ চলা অবস্থায় দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজেস করলেন : কি হয়েছে লোকটির বলা হলো-ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও

ইবাদাত কৰাৰ মধ্যে মশগুল থাকেন) এ কথা শুনে হয়ৱত আয়েশা (ৱা.) বললেন, ‘ওমৰ ছিলেন কাৱাদেৱ নেতা কিন্তু তাৰ অবস্থা ছিল, পথ চলাৰ সময় জোৱে জোৱে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোৱে জোৱে বলতেন, যখন মাৰধৰ কৰতেন খুব জোৱে শোৱেই মাৰধৰ কৰতেন।’ (তাফহীমুল কোরআন)

মুমিনেৱ আচৰণ মূৰ্খতাৰ জবাবে হয় শান্তিপূৰ্ণ

মূৰ্খ বলতে অশিক্ষিত বা লেখা পড়া জানেনা, অক্ষৰ জ্ঞান নেই এমন লোককে বুঝানো হয়নি। বৰং মূৰ্খ বলতে এমন লোককেই বুঝানো হয়ে থাকে যাদেৱ মধ্যে ধীনদারিতাৰ কোনো জ্ঞান নেই, যারা ধৰ্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূৰ্ণ মুক্ত। যারা জাহেলি কৰ্মকাণ্ডে লিঙ্গ হবাৰ উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন সভ্য-অনু ও ধীনদারি লোকেৰ সাথে অশালীন ব্যবহাৰ কৰে। মুমিন বান্দাদেৱ বৈশিষ্ট্য হবে তাৰা এসব মূৰ্খ লোকদেৱ গালি বা অশালীন ব্যবহাৰেৰ জবাবে গালি বা অশালীন ব্যবহাৰ এবং দোষারোপেৰ জবাবে দোষারোপ কৰবে না। বেহৃদাপনাৰ জবাবে বেহৃদাপনা কৰবে না। বৰং যারাই তাঁদেৱ সাথে এহেন আচৰণ কৰে তাদেৱ সালাম দিয়ে মুমিন সামনেৰ দিকে অগ্রসৰ হয়ে যায়। আল্লাহ রাকুন আলামীন বিষয়তি সুস্পষ্ট কৰে উল্লেখ কৰে দিয়েছেন-

وَإِذَا سَمِعُوا الْلُّغَوْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا تَبْغِيِ الْجَاهَلِيَّةُ.

And when they hear vain talk, they turn away therefrom and say to us our deeds, and to you yours peace be to you: we seek not the ignorant.

‘আৱ যখন তাৰা কোনো বেহৃদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা কৰে যায় এবং বলে, আৱে ভাই : আমাদেৱ কাজেৰ ফল আমৱা পাবো আৱ তোমাদেৱ কাজেৰ ফল তোমৱা পাবে। সালাম তোমাদেৱ আমৱা জাহেলদেৱ সাথে কথা বলি না।’ (সূৱা আল কাসাস : ৫৫)

হযৱত জাফৰ ইবনে আবি তালিব (ৱা.) এৱ নেতৃত্বে মুসলমানৱা আবিসিনিয়ায় হিজৱত কৰলেন এৱপৰ যখন নবী (স.) এৱ নবুয়াত প্রাপ্তি এবং তাৰ দাওয়াতেৰ খবৰ সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্ৰায় ২০ জনেৱ একটি খৃষ্টান প্ৰতিনিধি দল প্ৰকৃত অবস্থা অনুসৰকানেৱ জন্য মক্কা মুয়ায়্যামায় এলো। তাৰা নবী

(স.) এর সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ করলো, কুরাইশদের বহু লোক এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী (স.) কে কিছু প্রশ্ন করলো। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন, তার পর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআনের কিছু অংশ তাদের সামনে পাঠ করে শুনালেন, কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুষ্ঠভাবে স্বীকার করলো এবং নবীজির প্রতি ঈমান আনলো। মজালিস শেষে আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী প্রতিনিধি দলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে তিরক্ষার করলো।

এরপর তারা প্রতিনিধি দলকে বললো : তোমাদের সময়টাতো বৃথা হইলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়ে ছিলো যে, এ ব্যক্তির (নবীজির স.) অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তাঁর কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।”

একথায় তাঁরা (মুমিনরা) জবাব দিলো : ভাইয়েরা তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলি বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমাদের পথে তোমরা চলতে থাকো। আমরা জেনে বুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বাধিত করতে চাই না।” (সীরাতে ইবনে হিশাম)

একজন মুমিন সর্বদা ভালো আচরণ দিয়েই মন্দ আচরণের মোকাবেলা করে থাকে। কেননা, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ জদুতা ও মানবতাবোধ থাকে সে মন্দের মোকাবেলায় ভালো আচরণ দেখতে পেলে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تُسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِإِلَيْهِ فَإِذَا أَخْسَنْتِ فَإِذَا الْذِي يَنْكِرُ وَيَنْهَا
عَدَاؤَهُ كَانَهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ.

Nor can Goodness and Evil be equal. Repel with what is better then will be between whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate: And no one will be granted such

goodness except those who exercise patience and self-restraint, none but persons of the greatest good fortune.

“ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মোকাবেলা করো, তখন দেখবে, যে তোমার শক্তি সেও প্রাণের বক্ষ হয়ে গেছে। এ শুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ শুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।” (সূরা হা-য়ীম আস সাজদাহ : ৩৪-৩৫)

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী হলো-

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ قَدْمَ عَيْتَةَ بْنُ حِصْنٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ يَا أَبَنَ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا تُعْطِنَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمْ بِيَنْتَ بِالْعَدْلِ فَعَصَبَ عُمَرُ حَتَّى هُمْ أَنْ يُؤْقَعُ بِهِ فَقَالَ الرُّوحُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنِبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَاءَ وَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন ওমর ইবনুল খাতাব (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে খাতাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন না। এ কথায় ওমর (রা.) ক্রোধাপ্তিত হলেন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তখন (হিসন-এর আতুল্পুত্র) ত্বর ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর তায়ালা তাঁর নবী (স.) কে বলেছেন : ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মৃখদের এড়িয়ে চলো,” (সূরা আল আরাফ : ১৯৯) রাবী (আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা.) বলেন আল্লাহর শপথ! এ আয়াত শুনে ওমর (রা.) আর অঘসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ শুনা মাত্রই সর্বাধিক অনুগত হয়ে যেতেন। (বুখারী)

মুমিন রাত কাটায় আল্লাহর ইবাদতে ।

মুমিন বান্দাদের দিন কাটে রিযিক অহেবণ ও আল্লাহর পথে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর রাত কাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিন বান্দাদের রাত আরাম-আয়েশ, নাচ-গানে, খেলা-

তামাশায়, গপ-সপে এবং আজডাবাজী ও চুরি-চামারীতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলিয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে মুমিনরা এ সমাজে এমন সব সৎকর্মসম্পাদনকারী যাদের রাত কাটে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বসে, শয়ে দোয়া ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিনদের এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত আয়ত নাফিল হয়—

تَنْهَىٰفٌ جِئْنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

They forsake their beds of sleep, the while they call on their Lord, in Fear and Hope and they spend (in charity) out of the sustenance which we have bestowed on them.

“তাদের (মুমিনদের) পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যা কিছু রিয়িক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।” (সূরা আস সাজদাহ : ১৬)

মুমিনরা আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে রাত কাটাবার পরিবর্তে নিজেদের রবের ইবাদত করে। তাদের অবস্থা এমন সব দুনিয়া পূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা-তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে, তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন করে।

আল্লাহ রাবুল আলামীন বান্দাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি চান অপরাধী বান্দারা ফিরে আসুক। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল (স.) বলেছেন : এক মরুযাত্রী পথ চলছিল। পথ চলতে গিয়ে এক পর্যায়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পথিক বিশ্রামের প্রয়োজনবোধ করলো। বিশ্রাম নিল, বিশ্রাম থেকে উঠে দেখে তার বেঁধে রাখা উটটি নেই, যে উটটিতে ছিল তার খাদ্য-বস্ত্র পানীয় সরবরাহ। রাসূল (স.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন এমন অবস্থায় এই পথিকের অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) লোকটির তো আর হতাশার সীমা থাকবে না। কেননা তার বেঁচে থাকার সকল উপকরণ এই উটটির ওপর ছিল। রাসূল (স.) বললেন কিছুক্ষণ হতাশার সাথে চিন্তা করার পর উটটি ফিরে এলো। এমতাবস্থায় লোকটির অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় লোকটির

তো দিলটি ভরে যাবে। কারণ লোকটি শুধু উটটি পায়নি বরং বেঁচে থাকার সকল উপকরণও ফিরে পেলো।

রাসূল (স.) বললেন সাহাবীরা শুনো- উট হারানোর পর পুনরায় ফিরে পাওয়ার পর উটহারা ব্যক্তি যেমন খুশি হয়ে যায় তেমনিভাবে আল্লাহর কোন বান্দা যখন পথহারা হয়ে পুনরায় ফিরে আসে, উটহারা ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ রাকুল আলামীন বেশী খুশি হয়ে যান।

এ পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের ভুল বা অপরাধ করে থাকে। যার সাথে অপরাধ করা হয় সে কখনো বলে না যে, এসো অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। বরং ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা করতে চায় না, শুধু প্রতিশোধই নিতে চায়। ব্যবৎ পিতা-মাতাও সন্তান ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত ক্ষমা করে না। মন বলে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিব। কিন্তু ডেকে ডেকে বলে না এসো ছেলে অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। কিন্তু একমাত্র দয়াবান প্রভু আল্লাহ রাকুল আলামীন প্রত্যেক গভীর রাতে প্রথম আসমানে আসেন এবং ডেকে ডেকে বলেন তোমরা কে কি অপরাধ করেছ, আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দেব। আর এ সুযোগ প্রতিনিয়ত মুসলিমগণ কাজে শাগান; হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَقِنُ ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْأَخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ۔

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : আমাদের মহান বরকতময় রব প্রতিরাতে দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আকাশে) আগমন করেন। তিনি আগমন করেন তখন যখন এক-ত্রৈয়াংশ রাত থাকে তখন তিনি ডেকে বলেন : কে আছে আমার কাছে দোয়া করার, আমি তার দোয়া করুল করবো? কে আছে আমার কাছে চাওয়ার, আমি তাকে দান করবো? কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমি তাকে ক্ষমা করবো? (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিয়ী)

মুসলিম রাতের প্রথমার্দে একটু ঘুমিয়ে পুরো দিনের ঝাঁকি দূর করে শেষ রাতে উঠে গিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। কর্কু করে, সেজদাহ করে, চোখের পানি

ছেড়ে দিয়ে দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ রাকুন আলামীন ইরশাদ করেন-

كَائِنُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْجِعُونَ — وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ —

They were in the habit of sleeping but little by right. And in the hours of early down, they (were found) praying for forgiveness.

“রাত্রি কালে তারা কমই ঘুমায় এবং অতি প্রত্যুষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।”
(সূরা আয যারিয়াত : ১৭-১৮)

মুমিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাবে এবং অল্প সময় ঘুমাবে এবং রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ তায়ালা তোমার যতটুকু ইবাদত-বন্দেগি করা আমার কর্তব্য ছিল তা করতে আমার জ্ঞান হয়েছে। একজন মুমিন আল্লাহর দাসত্বের একপ পরাকার্তাই দেখাবে যে, সে আল্লাহর বন্দেগিতে জীবনতিপাত করবে এবং তা সঙ্গে এজন্য কোনো রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান করার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে।

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান শিক্ষক বিশ্বনবী (স.) রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে সুম ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। হাদীস শরীফে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ أَخْرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَشِهِ فَإِذَا آذَنَ الْمُؤْذِنُ وَبَثَ فَانِ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَلَا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

হ্যরত আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত আয়েশাকে জিজেস করলাম, নবী (স.) এর রাতের নামায কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন : তিনি [রাসূল (স.)] রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে সুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন এবং তারপর আবার শয়ে পড়তেন। পরে মুয়ায়িন যখন আযান দিতেন তখন তিনি (বিছানা ছেড়ে) দ্রুত উঠে পড়তেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করে নিতেন, অন্যথায় শুধু অযু করে (মসজিদের দিকে) চলে যেতেন। (বুখারী)

অর্থাৎ, শুধু সারারাত ঘুমের মধ্যে বিশ্বনবী (স.) কাটিয়ে দিতেন না। দিনের বেলায় মানুষের কল্যাণে, দ্বিন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর রাতের বেলায় আল্লাহর সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে আত্মগুদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একজন মুমিন সে আল্লাহর রাসূলের সঠিক অনুসরণের মধ্য দিয়ে দণ্ডয়মান অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য রাত কাটিয়ে দিবে।

মুমিন সর্বদা আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চায়

মুমিন ব্যক্তি যতই ইবাদত করুক না কেন, যতই দান খয়রাত করুক না কেন। কেন ইবাদত বা দান খয়রাতই মুমিনের মধ্যে অহংকারের জন্ম দিতে পারে না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর পথে জিহাদ করি, যাকাত দেই, ইজ করি এবং এসবের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন আমরা নিশ্চিতভাবে পাবো। কাজেই জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের কোন গর্ব-অহংকার মুমিনের হস্দয়ে জায়গা নিতে পারে না। বরং নামায রোধা, হজ, যাকাত, দাওয়াতী কাজ, জিহাদ, দান খয়রাতসহ নিজেদের যাবতীয় সৎকাজ ও ইবাদত-বন্দেগির পরেও তাঁরা এ ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে, তাদের কাজের ভুল-ক্রটগুলো বুঝি তাদের আযাবের কারণ হবে। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাসহ সকল অপরাধগুলোকে বার বার স্মরণ করে এবং মহান দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরম দয়াবান আল্লাহর দয়া ও অনুভাবের মধ্য দিয়ে তাঁর পরকালের আযাব হতে পানাহ চায় মুমিন।

মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নেক আমল করা সত্ত্বেও কাফির মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয় না। সে প্রত্যেক পদে পদে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাকুন আলামীনের আযাবকে ভয় করতে থাকবে এবং তা থেকে পানাহ চাইতে থাকবে। কোরআন বলছে-

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّسْفِقُونَ

And those who fear the punishment of their Lord.

“যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।” (সূরা আল মা’আরিজ : ২৭)

অর্থাৎ মুমিনরা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজকর্মে সদাচরণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থাকে। তারা সবসময় ভাবতে থাকে যে, না জানি আল্লাহর আদালতে আমাদের ক্রটি-বিচৃতি আমাদের কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং আমরা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন

হয়ে যাই, যে আয়াব হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘ ও স্থায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.

We only fear a Day of frowning and distress from the side of our Lord.

“আমরাতো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আয়াবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘদিন।” (সূরা আদদাহর : ১০)

এ পৃথিবীর অনেক মানুষ অনেক মানুষকে অনেক ধরনের শান্তি দিয়ে থাকে। আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ শান্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যার পরে আর কোন শান্তি দিতে পারে না, দিলেও শান্তিপ্রাপ্ত তা উপলক্ষ্মি করতে পারে না। কিন্তু যহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের শান্তি হলো অত্যন্ত কঠিন যে শান্তির আলামত পৃথিবী উপলক্ষ্মি করতে পারে না। আল্লাহ রাবুল আলামীন বলেছেন-

إِنْ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.

Truly strong is the Grip of thy Lord.

“নিচয়ই তোমার রবের পাকড়াও (আয়াব) বড়ই শক্ত।” (সূরা আল বুরজ : ১২)

সেই শক্তিশালী আয়াবে শুনাহগার যখন পতিত হবে তখন সে ঐ শক্তিশালী আয়াবে বাঁচবেও না আবার মরবেও না অর্থাৎ পরকালীন পুরো জীবনে সেই শক্তিশালী আয়াবের কাঠিন্যতায় পড়ে থাকতে হবে, আল্লাহ তায়ালা পরিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন-

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى — ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيُ —

Who will enter the Great fire, in which he will then neither die nor live.

“যে বৃহৎ আগনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।” (সূরা আলা : ১২-১৩)

হিটলার শাট লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল, যার জন্য যদি তাকে শান্তি দেয়া হতো তা হলে তাকে সর্বোচ্চ শান্তি একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত। আর একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে একজন মানুষ হত্যার বিচার করা হতো। বাকী ৫৯,৯৯,৯৯৯ জন মানুষ হত্যার বিচার বাকি থেকেই যেত।

সুতরাং ৬০ লক্ষ মানুষ হত্যার বিচার যেন করা যায় সে রকম একটি ব্যবস্থা তার জন্য করা উচিত ছিল যেন একটি হত্যার শাস্তি থেকেও সে রেহাই না পেতো, কিন্তু বাস্তবতা হলো এ ব্যবস্থা তৈরী করা পৃথিবীর কোনো আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি সম্ভব একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের আদালতের পক্ষে। যেখানে আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আবার বাঁচার মত বাঁচারও কোনো অবকাশ নেই। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহসাদও পাবে না।

মুমিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন ও যজ্ঞগাদায়ক এবং তাঁর আযাবকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি সৃষ্টিকূলে কারো নেই। আল্লাহ রাবুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সতর্কসুলভ ভাষা দিয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন-

فَإِنْ كَذَّبُوكُمْ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُ بِأَسْهَمِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُخْرِمِينَ.
If they accuse thee of falsehood, say: your Lord is full of mercy all-embracing, but from people in guilt never will His wrath be turned back.

“এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুহাত সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রন্দ করা যেতে পারে না।” (সূরা আল আনআম : ১৪৭)

অন্যত্র আল্লাহ রাবুল আলামীন বলেন-

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَغْصِنُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.

The son replied: I will betake myself to some mountain: it will save me from the water. Nuah Said: this day nothing can save. From the Command of Allah, any but those on whom He hath mercy! and the waves Came between them, and the Son was among those who were drowned.

“সে (নূহ এর ছেলে) বললো, আমি এখনই একটি পাহাড়ে ঢড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললো আজ আল্লাহর হুকুম (আযাব) থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়। এমন সময়

একটি তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হয়ে গেলো।” (সূরা হৃদ : ৪৩)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহকাল ও পরকালে গুনাহগারদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আয়াব হতে পারে। দুনিয়াতে কখনো জলোচ্ছাস, কখনো ভূমিকম্প, কখনো ঘূর্ণিবড়, কখনো ডাইরিয়া কখনো কলেরা, কখনো মহামারি আবার কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ইত্যাদি। আল্লাহর আয়াবের ধরনের কোন শেষ নেই। কর্ম অনুযায়ী যখন যেখানে যে আয়াব দেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন, তখন সেখানে সে আয়াবই আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন। সে আয়াবগুলো বড় হোক অথবা ছোট হোক মুমিন তা থেকে সর্বদা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। আর পরকালের আয়াবেরতো কথাই নেই, দুনিয়াতে আমরা যে আয়াব অবলোকন করি আল্লাহর ভাষায় তা হলো পরকালের নমুনামাত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرٌ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Such is the Punishment (in this life), but greater is the punishment in the Hereafter, if only they knew.

“আয়াব এরপই হয়ে থাকে, আখেরাতের আয়াব এর চেয়েও বড় হায় তারা যদি জানতো।” (সূরা আল কলম : ৩৩)

সুতরাং মুমিন ইহকালীন-পরকালীন, বড়-ছোট সকল ধরনের আয়াব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। সে অপরাধীদের ন্যায় বুক ফুলিয়ে অহংকারে মেতে উঠবে না।

মুমিন অপচয় করে না- কৃপণও হয় না

মুমিন এমন হবে না যে, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, মদ-জুয়া, মেলা-পার্বন এবং বিয়েশাদীর পিছনে অতেল টাকা-পয়সা খরচ করবে এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশী নিজেকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঢ়ী-গাঢ়ী, সাজ-গোছ ইত্যাদির পিছনে অতেল টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিবে। মুমিন আবার এমনও হবে না যে, অর্থলোভীর মতো একটা পয়সা গুনে গুনে রেখে কৃপণতার চরম শিহরে আরোহণ করবে। নিজে খাবে না, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটাবেনা, এ ধরনের লোক আরবে আল্লাহর রাসূলের সময় বিপুল সংখ্যক পাওয়া যেতো।

এ প্রসঙ্গে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয় এক, অবেধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও। দুই, বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থ্যের চাহিতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থ সম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাস-ব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিনি সৎকাজে ব্যয় করা, কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। যেমন- এক, মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই, ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রাক্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ।

গব, অহংকার ও ভোগবিলাসে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। আর এ-অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই শয়তানের ভাই। আল্লাহ রাকবুল ইস্জত ওয়াল জালাল ইরশাদ করেন-

وَاتِّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبْذِرْ بَيْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ مُّتَّكِئِينَ مَعَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

And render to the kindred their due rights, as to those in want and to the way farer. but Squander not in the manner of a spendthrift. verilly spendthrifts are brothers of the satans and the satan is to his Lard (Himself) ungrateful.

“আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও। অপব্যয় করো না। যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।” (সূরা বনী ইসরাইল : ২৬-২৭)

সম্পদ ব্যয়ে যদি মানুষ ভারসাম্য রক্ষা না করে তাহলে মানুষ হয় অপমানিত হয়ে যায় অথবা নিঃশ্ব হয়ে যায়। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, বাজে ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে ও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন
করখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে।
আশ্চর্য বলেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبُسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُوتًا مَحْسُورًا.

Make not thy hand tied (like a niggard's) to thy neck, nor stretch it forth to its utmost reach, So that thou becom blame worthy and destitute.

“নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করোনা) এবং তাকে একেবারে
খোলাও ছেড়ে দিওনা (অপচয় করোনা), তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে
যাবে।” (সূরা বনী ইসরাইল : ২৯)

কৃপণতা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে ইহকালীন জীবনে
হতে হয় অপমানিত এবং পরকালীন জীবনে পতিত হতে হয় এক কঠিনতম ও
যত্নগাদায়ক স্থানে। কালামে হাকীমে বর্ণিত হয়েছে—

الذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَةً — يَخْسِبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ — كَلَّا لِكَبِدَنْ فِي الْحُطْمَةِ.

Who piluth up wealth and layxeth it by, thingking that his wealth
would make him last for ever. By no means! He will be sure to
be thrown into that which Breaks to pieces.

“যে অর্থ : সম্পদ জমা করে এবং তা ওনে ওনে হিসাব রাখে, মনে করে তার এ
অর্থ-সম্পদ চিরদিন তারই থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী
জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।” (সূরা আল হুমায়াহ : ২-৪)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর হাদীস হলো—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ
وَالْبَحِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ
—
وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

হ্যারত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন, দাতা

ব্যক্তি আল্লাহর যেমন নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী মানুষেরও। আবার বেহেশতের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি জাহানাম থেকে বেশ দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে যেমন দূরে, তেমনি দূরে মানুষের কাছ থেকে ও বেহেশত থেকে, অপরদিকে সে জাহানামের খুব নিকটবর্তী। আর একজন অশিক্ষিত দাতা ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।” (তিরমিয়ী)

রাসূলে আকরাম (স.) আরো ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حِبٌّ وَلَا بَعْيْلٌ وَلَا مَنَانٌ.

হ্যরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (স.) বলেছেন, “প্রতারক কৃপণ ও খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (তিরমিয়ী)

সুতরাং একজন মুমিন যখন ব্যয় করে তখন তার মধ্যে সর্বোচ্চ ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে, না সে অথবা ব্যয় করবে আবার না সে শুধু গুনে গুনে জমা করবে। প্রয়োজনের আলোকে খরচ করবে। আল্লাহ তায়ালা পরিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً.

Those who, when they spend are not extravagant and not niggardly, but hold a just (balance) between those (extremes).

“তারা (মুমিনরা) যখন ব্যয় করে তখন অথবা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।” (সূরা আল ফুরকান : ৬৭)

মুমিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না

আরবের বুকে অঙ্ককার ছেদে আলোর প্রদীপ বিশ্বনবী (স.) যখন আগমন করেন তখন আরব সমাজে সবচেয়ে বড় তিনটি গুনাহের প্রচলন ছিল, যেমন- ১. শিরক, ২. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ৩. যিনা করা।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার মবী (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে কর। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি

করেছেন। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নিবে।” আবার জিজ্ঞেস করা হলো : ‘তারপর কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর।’ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসাই, আহমদ)

তৎকালীন আরব ভূখণ্ডে মানুষ হত্যা ছিল একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলার ন্যায়। জীবনের কোন মূল্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই একে অন্যকে হত্যা করে ফেলতো। আবার একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দেখা যেত যুগের পর যুগ যুদ্ধ-বিশ্বাস লেগেই থাকতো। এক্ষেত্রে তারা কোন কিছুরই তোয়াক্তা করত না। এমনকি যার সামনে তারা মাথা নত করত, যার পূজা করতো তাকেও মূল্যায়ন বা সম্মান করার মতো তাদের মানসিক শক্তি ছিল না। ‘জোর যার মূল্যক তার (might is right) নীতির অনুসরণ করত তারা। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল। ‘যুলখালাসাহ’ নামক ঠাকুরের আন্তরালে গিয়ে সে ধরনা দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যৎ কর্মপক্ষ জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। উক্ত জবাবে আরবটি ক্রোধাপ্তিত হয়ে বলতে থাকে—

لَوْ كُنْتَ يَادُ الْخَلْصَنَ الْمَوْتَوْرَ مِثْلِيْ كَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُورَ لَمْ تَهُنْ عَنْ قُتْلَ
الْعَدَاءَ زُورًا.

“হে যুলখালাসা! তুমি যদি আমার জায়গায়

নিহত হত যদি তোমার পিতা

তাহলে তুমি কখনো মিথ্যাচারী হতে না।

বলতে না, প্রতিশোধ নিয়োনা যালেমদের থেকে।”

হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর বুকে এমন একটি কর্ম যা কখনো কোন প্রকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কারণ হল লাল রং দিয়ে কখনো লাল রংকে ঢাকা যায় না। হত্যা শুধু মানব সমাজে বিপর্যয়ই ডেকে আনতে পারে। যে বিপর্যয়টিকে দূর করতে গেলে আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। সেই জন্য ইসলাম এই রূপ একটি বিপর্যয়কে সারা পৃথিবীর জন্য বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ রাকুল আলামীন পরিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন—

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلَ النَّاسَ حَمِيقًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانُوا أَحْيَا النَّاسَ حَمِيقًا وَلَقَدْ حَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثُرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْتَرِّفُونَ.

On that account : we ordained for the Children of isreal that if any one slew a person-unless it be for murder or for speading mischief in the land-it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life. It would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them our Messengers with Clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excenes in the land.

“এ কারণেই বনী ইসরাইলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো।

আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রাস্লগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে এলো তাদের কাছে, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারীই থেকে গেলো।” (সূরা আল মায়দা : ৩২)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে কেবলমাত্র ঐ এক ব্যক্তির ওপর ঝুলুম করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। কাজেই সে সমগ্র মানবতার শক্তি। কারণ তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব বিরাজমান যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে সে আসলে মানবতার সাহায্যকারী ও সমর্থক, তার মধ্যে এমন শুণ বিরাজমান, যার ওপর মানবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কারণ হলো তার মধ্যে বিরাজমান শুণটি যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে কোন

হত্যাকাও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হত্যা করা যাবে এমন পাঁচটি বৈধ কারণ রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

فُلْ تَعَالَوْا أَئِلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مَنْ إِنْلَاقٌ شَرُّنْ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَغْرِبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ.

Say : come, I will rehearse what Allah hath (really) prohibited you from: join not anything with Him. Be good to your parents, kill not your children on a plea of want, we provide sustenance for you and for them, come not nigh to indecent deeds, whether open or secret, take not life, which allah hath made sacred except by way of justice and law: thus doth He command you, that ye may learn wisdom.

“(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, এসো আমি তোমাদের ওনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন,

১. তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।
২. পিতা-মাতার সাথে সম্মতিবহার কর।
৩. দারিদ্র্যের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেব।
৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের (যিনার) ধারে কাছেও যেও না।
৫. আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না।

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের এ বিষয়গুলো নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে চিন্তে কাজ করবে।” (সূরা আল আনআম : ১৫১)

উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় বা আদেশ-নিষেধ লজ্জন করবে যারা তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান এটা বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু এর বাইরে (ন্যায়সঙ্গত ছাড়া) কোন মানুষকে হত্যা করা যাবে না। তাই একজন আল্লাহর প্রিয় মুমিন বাদ্দা ন্যায়সঙ্গত ছাড়া কোন হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Nor slay such life as Allah has made sacred, except for just cause.

“আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া (রহমানের বাদ্দারা মুমিনরা) তাকে হত্যা করে না।” (সূরা আল ফুরকান : ৬৮)

মুমিন মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা সাক্ষী হবে না

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী সেই সব আচার-আচরণকে দুশ্চরিত্ব বলা হয়, মানুষের সুস্থ বিবেক বৃক্ষি যাকে সর্বদা এড়িয়ে চলে। এসব দুশ্চরিত্ব যখন কোন ব্যক্তি বা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তাকে ধৰ্ম ও বিপর্যয়ের হাত থেকে আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি আর রক্ষা করতে পারে না। সেই সব দুশ্চরিত্রের কোন ছায়াও যেন ব্যক্তি বা সমাজে বিস্তার লাভ করতে না পারে। সে ব্যাপারে কোরআন ও হাদীস জোর তাগিদ দিয়েছে। আর সেই সব দুশ্চরিত্রের মধ্যে অন্যতম হলো মিথ্যাবাদী হওয়া। যার জন্যই কোরআন বলেছে-

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

And Shun the word that is false.

“মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো।” (সূরা আল হজ্জ : ৩০)

কথা ও কাজের যত খারাপ শাখা বা দিক রয়েছে, তার মধ্যে মিথ্যা হচ্ছে তার লিভার বা প্রধান। মিথ্যে থেকে যে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না অথবা মিথ্যেকে যে পরিহার করতে পারে না, তাকে দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর কোনো কাজের আশাই করা যায় না এবং সে নিজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লানত প্রাপ্ত হয়ে থাকে, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

That he solemnly invokes the curse of Allah on himself if he tells a lie.

“তার ওপর আল্লাহর লানত হোক, যদি সে মিথ্যবাদী হয়!” (সূরা আন নূর : ৭) এখানে মিথ্যবাদীর ওপর লানত মানে হল সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহর আক্রোশ ও গবেষণে পতিত হবে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে কুফর ও যুনুমের পর কেবল মিথ্যের জন্য এ ডয়ানক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর যারা মিথ্যবাদী তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিক বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

And Allah beareth witnesss that the Hypocrites are indeed liars.

“অল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যবাদী।’ (সূরা আল মুনাফিকুন : ১)

সত্যের মধ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমীন এমন উত্তম প্রভাব রেখেছেন, যে প্রভাব সত্যবাদী লোককে নেক কাজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে সত্যবাদী লোক নেককার লোকে পরিণত হয়ে যায়, আর নেককার লোকেরাই জান্মাতের অধিকারী হয়ে থাকে। বিপরীত দিকে মিথ্যের এমন খারাপ প্রভাব মিথ্যবাদী লোকের দিলে পড়ে, যার ফলে সে খারাপ কাজ করতে থাকে। আর পাপী ব্যক্তিরাই জাহানামে নিষ্কিঞ্চ হয়ে থাকে। সহীহ হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْنَعُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفَحْرُورِ وَإِنَّ الْفَحْرُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

(بخارى و مسلم)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, “সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে

যায়। আর মিথ্যা লোকদেরকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর খারাপ কাজ লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক যখন নিয়তই মিথ্যে বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।” (বুখারী ও মুসলিম)

ভীরুতা ও কৃপণতা অবশ্যই কুস্তাবের অস্তর্ভূত, কোন সন্দেহ নেই। একজন দুর্বল ইমানদারের মধ্যে এ দুটি বা দুটির যে কোন একটি থাকতেই পারে। আর দুটি স্বভাব খারাপ হলেও কিন্তু ইমানের পরিপন্থী নয়। তবে মিথ্যে স্বভাবটি এমন একটি ঘৃণিত স্বভাব যা সম্পূর্ণ ইমানের বাস্তব পরিপন্থী। সুতরাং একজন প্রকৃত মুমিন কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে—

وَعَنْ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قُبِّلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنِ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِبِيلَ لَهُ أَيْكُونُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِبِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنِ كَذَبًا قَالَ لَا.

হ্যারেত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূলকে জিজেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : হ্যাঁ (মুমিন ব্যক্তি ভীরু হতে পারে) আবার জিজেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : হ্যাঁ (দুর্বল মুমিন ব্যক্তি কৃপণ হতে পারে) অতঃপর জিজেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : না (মুমিন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না)। (মুয়াস্তা, বায়হাকী)

স্বাভাবিকভাবে মিথ্যে বলা, মিথ্যে সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যের পক্ষ নেয়া হারাম। তবে মহৎ উদ্দেশ্যে যদি কখনো মিথ্যে বলতে হয়, তাহলে মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে ঐ মিথ্যে বৈধ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, কোন ঘাতক কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারও কাছে তার ঠিকানা বা অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়, আর এমতাবস্থায় সে যদি মিথ্যে বলে হত্যার হাত থেকে এ লোকটিকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার এ মিথ্যে বলা শুধু জায়েহই নয় বরং ওয়াজিব। পরম্পর দুঃজনের মধ্যে বাগড়া মিটাবার উদ্দেশ্যে কোন অসত্য কথা বলতে চাইলে তাও জায়েহ হওয়ার ফতোয়া ওলামায়ে কেরামগণ দিয়েছেন, হাদীস শরীফে এসেছে—

عَنْ أَمْ كُلُثُومٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْبَغِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ حَيْرًا.

হয়রত উম্মে কুলসুম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (স.) কে একথা বলতে শনেছেন : “পরম্পর দুর্জনের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য যে অসত্য কথা বলে সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যেবাদী নয়, কেননা সে কল্যাণার্থে অথবা কল্যাণ সাধনের জন্য চেষ্টা করছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মিথ্যা কথা বলা কবিরা শুনাই। তবে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা কথার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলাফল এমন যে, আকাশকে যীন বানিয়ে দেয় এবং যীনকে সাগর বানিয়ে দেয় অর্থাৎ মিথ্যে সাক্ষ্য খুনিকে মৃত্যি দিয়ে দেয় আর বাদীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় এজন্যই ছজুরে আকরাম (স.) খুব শুরুত্তের সাথে মিথ্যা সাক্ষীদানের ব্যাপারে কথা বলেছেন। যা সহীহ হাদীস ঘষ্টে এসেছে-

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُنْبَثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (ص) — ثَلَاثَةُ أَكْبَرُكُمْ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَنْكُنَا فَجَلَسَ فَقَالَ لَا وَقَوْلُ الرُّؤْرِ وَشَهَادَةُ الرُّؤْرِ لَا وَقَوْلُ الرُّؤْرِ وَشَهَادَةُ الرُّؤْرِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لِيَلَّتْهُ يَسْكُنْتُ . (بخاري و مسلم)

হয়রত আবু বকর (রা.) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (স.) বলেছেন : আমি কি তোমাদের শুনাসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় শুনাই সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি অবশ্যই আমাদের তা বলবেন, ছজুর (স.) বললেন : তা হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ পর্যন্ত হয়ুর (স.) হেলান দেয়া অবস্থায় বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : সাবধান! আর হল মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া— এভাবে বার বার এই বাক্যটি বলতে থাকলেন তিনি। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে থাকলাম, আহ! ছজুর (স.) যদি কথা বক্ষ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিনরা হবে পরম্পর ভাই ভাই

মুসলিম বিশে ভ্রাতৃত্বের যে বক্ষন পৃথিবীর অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে অনুরূপ ভ্রাতৃত্বের বক্ষন পাওয়া যায় না। পৃথিবীর যে কোন

অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা ব্যথা পেলে অন্য অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা সেই ব্যথায় ব্যথিত হয়, কোন প্রকার কষ্টের স্থীকার হলে সে কষ্টে কঠিত হয়। তবে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হলো শর্ত হলো ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রকৃত মুমিন হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

হ্যরত সাহল ইবনে সাইদ সায়েদী থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন :

“একজন মুমিনের সাথে আরেকজন মুমিনের সম্পর্ক ঠিক তেমন- যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে মুমিনের প্রতিটি দৃঢ় কষ্ট ঠিক তেমন অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে।” (মুসনাদে আহমদ)

অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (স.) বলেছেন : “পারম্পরিক ভালবাসা, সু-সম্পর্ক একে অপরের দয়া মায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মতো। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন, তাতে গোটা দেহ জুর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকতে থাকে।” (বুখারী, মুসলিম)

একজন মুমিনের জ্ঞান-মাল, ইজ্জত-সম্মান অপর মুমিনের কাছে আমানত। এ আমানতের যদি কেউ খে়য়ানত করে তাহলে এর চাইতে বড় অপকর্ম আর হতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে- হ্যরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) ও হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী কর্যাম (স.) বলেছেন- একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিভ্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নেই।” (মুসনাদে আহমদ)

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যত দৃঢ় সম্পর্ক থাকুক না কেন তবুও যেই কোন বিষয়ে মতানৈক্য হতেই পারে। কেননা, “যতজন ততমন- রব তব একজন।” তবে কথা হলো মতানৈক্যটি স্থায়ী হতে পারবে না। মতানৈক্য সৃষ্টি হলেই সেখানে মীমাংসার পথ বেছে নিতে হবে এটি হল কোরআনের নির্দেশ। আল্লাহ রাকুল আলামীন বলেন-

وَإِنْ طَائِفَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلِحُوهُا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْدَ إِنْجَاهَمَا عَلَىٰ أَلْخَرِيٍ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغِيٌ حَتَّىٰ تَفْيِيٌ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهُا

يَتَّهِمُهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ — إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْةٌ فَأَصْلِحُوهُا بَيْنَ أَنْهَوْيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ.

If two parties among the Believers fall into a fight, make ye peace between them: but if one of them transgresses beyond bounds against the other, then fight ye (all) against the one that transgresses until it complies with the command of Allah, but if it complies, then make peace between them with justice, and be fair. for Allah loves those who are fair (and just).

The Believers are but a single Brotherhood. So make peace and reconciliation between your two (contending) brothers. and fear Allah, that ye may receive Mercy.

“মুমিনদের মধ্যকার দু’টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিঙ্গ হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু’টি দলের কোন একটি দল অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো, আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।” (সূরা আল হজুরাত : ৯-১০)

অর্থাৎ, একে অপরের সাথে ভাত্ত সম্পর্ক মজবুত করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে, পরস্পরের মধ্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও। কেউ যেন কারো ওপর বিরূপ না থাকে। অবস্থা এরূপ হয়ে গেলে দ্রুত তাদের মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত।

রাসূল (স.) বলেছেন— “মুসলমান ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিন থাকবে, সামনাসামনি হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফিরাবে এটি কোন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। দু’জনের মধ্যে সেই উন্নত যে আগে সালাম দিবে।”

কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ আলোকে মুমিনদের পরম্পরের মধ্যে স্থায়ী আত্ম ও সম্প্রতি স্থাপনের জন্য যে বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে শালন করতে হবে তা হলো-

১. একে অন্যের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা।
২. একে অন্যের সম্মানহানি না করা।
৩. একে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করা।
৪. একে অন্যের মনে কষ্ট না দেয়া।
৫. একে অন্যকে দোষারোপ না করা।
৬. একে অন্যকে বিকৃত নামে না ডাকা।
৭. একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা।
৮. একে অন্যের পিছনে না লাগা।
৯. একে অন্যের পিছনে গীৰত (পরচর্চ) না করা।
১০. একে অন্যের বিরুদ্ধে চোগলখুরি না করা।
১১. একে অন্যকে গালি না দেয়া।
১২. একে অন্যের সম্পদ নষ্ট না করা।
১৩. একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা।
১৪. একে অন্যের সাথে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক বজায় রাখা।
১৫. একে অন্যের সাথে মনোমালিন্য হলে মীমাংসা করে নেয়া।
১৬. একে অন্যকে কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করা।
১৭. একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।
১৮. একে অন্যকে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান করা।
১৯. একে অন্যের প্রতি মিষ্টভাষী হওয়া।
২০. একে অন্যের জন্য সভা-সমাবেশে জায়গা করে দেয়া।
২১. একে অন্যের জন্য দোয়া করা।
২৩. একে অন্যকে সালাম দেয়া।
২৪. একে অন্যের সালামের উত্তর উত্তমভাবে নেয়া।
২৫. একে অন্যকে সাধ্যানুযায়ী দাওয়াত দেয়া এবং আপ্যায়ন করানো।
২৬. একে অন্যের জানায়ার নামাযে অংশগ্রহণ করা।

২৭. সংঘবন্ধভাবে থাকা।
২৮. সংঘবন্ধভাবে নামায আদায় করা।
২৯. সংঘবন্ধভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা।
৩০. সংঘবন্ধভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজ করা।
৩১. সংঘবন্ধভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।
৩২. সংঘবন্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা।
৩৩. সংঘবন্ধভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়ানো।

মুসিন হবে ধৈর্যশীল

আল কোরআনে নেতৃত্বকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য যেসব বিষয়ের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ধৈর্যই হচ্ছে মূল ভিত্তি। ধৈর্য যখন মুসিনের মধ্যে পূর্ণভাবে এসে যায় তখন সে সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেই কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হলে সাহস ও হিমতহারা না হয়ে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যর্থতা তার হাদয়ে কোন জায়গা নিতে পারে না। যখন আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায়না তখনো মুসিনরা সত্যের পথে টিকে থাকে।

মুসিন ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে সত্যের পথে টিকে থাকে যখন, আল্লাহর রহমত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় তখন। ফেরাউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনী ইসরাইলকে হ্যারত মূসা (আ.) নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন : তোমাদের অবস্থা যতই নাজুক ও সংগ্রিন হোক না কেন, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহর রহমত, কুদরত ও হিকমত দেখতে পাবে। পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর, যাকে খুশি তিনি কর্তৃত দান করেন। আল্লাহ তায়ালার কালামুল হাকীমে প্রায় ছবছ এ বিষয়টি এসেছে-

قَالَ مُوسَىٰ لِّقَوْمِهِ اسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

Said Moses to his people: Pray for help from Allah, and (wait) in patience and constancy: for the earth is Allah's, to gine as a heritage to such of His servants as He pleaseth, and the end is (best) for the righteous.

“মূসা তাঁর জাতিকে বললো : আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো (সত্যের ওপর অবিচল থাক)। পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর যারা তাঁকে ডয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।” (সূরা আল আরাফ : ১২৮)

ধৈর্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যেমন-

এক. আবেগ উচ্ছাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দুই. কঠিন মুহূর্তেও সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নিজের নীতি আদর্শকে বিসর্জন না দেয়া।

তিনি. সত্যের পথে চলতে গিয়ে যাবতীয় যন্ত্রম নির্যাতনকে হাসিমুখে বরদাশত করা।

ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে চোখের পানি না ঝেলে, কারুতি-মিনতি না জানিয়ে, অঙ্গের প্রকাশ না করে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয় তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয়। কোরআনের ভাষায় যাকে স্বীকৃত করা হয়েছে—

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بَدْمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُوا
جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ.

They stained his shirt with false blood. He said, Nay, but your minds have made up a tale with you. patience is most fitting. against that which ye assert, it is Allah (alone) whose help can be sought.

“তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাবা বললো, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছে তাঁর ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেষ্টা করে পারে।” (সূরা ইউসুফ : ১৮)

এখানে যে স্বীকৃত জমিল বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, যে সবরের কোন প্রকার অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়ভীতি ও কান্নাকাটি কিছুই নেই। যে সবরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন নবী-রাসূলগণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আগন্তের কুণ্ডে ফেলে

দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তার চিন্তে চাঞ্চল্য ঘটেনি। হয়রত আয়ুব (আ.) এর গোটা দেহে পঁচন ধরলো। তাঁর আপনজন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলো; তিনি কোন অভিযোগ করলেন না। হয়রত ইয়াকুব (আ.) সন্তান হারিয়ে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন, তিনি কোন অভিযোগ করলেন না। বিশ্বনবী (স.) কে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো একটু বদদোয়াও করলেন না।

হয়রত আলী (রা.) বলেছেন : তিনটি সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময় এক. বিপদ মুসিবতে নিপত্তিত হলে ধৈর্যধারণ করা।

দুই. মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্যধারণ করা।

তিনি. আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার দৃষ্টান্ত তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (নবী-রাসূলদের ধৈর্য)। মহান আল্লাহর আদেশ-পালন করার সময় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন- নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোন মানুষ দণ্ডয়মান হয়, তখনতো সে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডয়মান হয়, এক্ষেত্রে তাড়াহড়া করা যেমনি ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি বেয়াদবীর শামিল। অনুরূপভাবে আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। যেই কোন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ধৈর্যের সাথে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বৃক্ষ মাতা-পিতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না, ঝীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্তানিকে ভালো পোশাক পরানো যাচ্ছে না এবং ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ানো যাচ্ছে না, নিজের মাথা গোজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয় বাড়ির মালিক কঁটু কথা শোনায়, এর বিপরীতে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে-কোন অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকাই হলো, আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

নাবিয়িন, সিদ্ধিকীন, শুহাদা ও সালেহীন এই চার শ্রেণীর লোকগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। আর এটি সন্তুষ্ট হয়েছে ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কারণেই। কেননা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারলে সফলতা অর্জন করা যায় এবং ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে অসীম বরকত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَلَّا يَحْفَظَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعِلْمٌ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَا
مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوَا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

For the present, Allah hath lightened your (burden), for he knoweth that there is a weak spot in you: but, if there are a hundred of you, patient and persevering, they will vanquish two hundred, and if a thousand, they will vanquish two thousand, with the leave of Allah: for Allah is with those who patiently persevere.

“অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক ধৈর্যধারণকারী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর, আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্যধারণকারী।” (সূরা আল আনফাল : ৬৬)

সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যে ধৈর্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পৃথিবীর সকল সফলতা তাকে হাতছানি দিয়ে ভাকে এবং মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ লাভে সে ধন্য হয়। আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি ও অনুগ্রহ নিপত্তি হয়, সারা পৃথিবী তার জন্য হয়ে যায়। কবি বলেন-

“আল্লাহ রাক্খুল আলামীনের দৃষ্টি যদি তার কোন গোলামের প্রতি নিপত্তি হয় তার সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়, তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোটা পানির প্রতি নিপত্তি হয় সে পানি ফোটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।”

সুতরাং মুসিন হতাশ হবে না, নিরাশ হবে না, নিখর হবে না এবং ভেঙ্গে পড়বে না। শত প্রতিক্রিয়ার মাঝে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে ধন্য করবে। মুসিন দেখতে পাবে তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমা হয়েছে, ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অমাবস্যার এমন কালো ছায়া তাকে আবৃত করছে যার সুবেহ সাদেকের সম্ভাবনার লক্ষণ নেই। তবুও সে হতাশ হবে না, ধৈর্য হারাবে না। মুসিন বিশ্বাস করবে অঙ্ককার যতই ঘনীভূত হোক সকালের লাল সূর্য উদিত হবেই হবে। না হয় এই অঙ্ককারেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তবুও সে কাপুরুষের ন্যায় অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় এই বলে-

বিড়ালের ন্যায় নয় বাঁচিব হাজার দিন,
বাঁচিব সিংহের ন্যায় হাজারের একদিন।

মুমিন সত্যবাদী হবে

মুমিন জীবন আর সত্যবাদিতা কখনো আলাদা হতে পারে না। মুমিন মানেই তাকে সত্যবাদী হতে হবে। সে যেমন ছয়টি সত্যের ওপর বিশ্বাস রেখে মুমিন হয়েছে তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি প্রতীক্ষণে সত্যের ওপর অবিচল ও অটুট থাকতে হবে। মুমিন শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেয় না, সে মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেয়, মূলত মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজের সমন্বয়ে দিনাতিপাতকারীকেই বলা হয় মুমিন। এ সমন্বয়ের ওপরই মুমিনের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُبُوا وَجَاهُدُوا بِسَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

Only those are Believers who have believed in Allah and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their persons in the cause of Allah: Such are the sincere ones.

“প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ও তারা পোষণ করে না, আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করে, তারাই সত্যবাদী।” (সূরা আল হজুরাত : ১৫)

একজন ব্যক্তি যখন সে নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইবে তখন তার ওপর প্রথম যে কর্তব্যটি বর্তাবে তা হলো সে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী করে নিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক বিধান হলো ‘যে যেমন চরিত্রের অধিকারী তার সঙ্গী সাথীও তেমনই জুটিয়ে দেন। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঝৌক-প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুসারেই তার সঙ্গী জুটে। সমাজের এক শ্রেণীর লোক বলে থাকে, লোকটি এতো ভালো লোক হয়ে খারাপ লোকদের সাথে মিশে কি করে? মূলত একথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি ইত্যাদির অধিকারী, তার বঙ্গ-বান্ধব, সাথী সঙ্গীও অনুরূপ জুটে যায়।

আল কোরআনের ভাষায়- মুমিন হয় মুমিনের বক্তু আর কাফির হয় কাফিরের বক্তু। মুমিনের হৃদয়ের বক্তু থাকে আরেকজন মুমিনের হৃদয়ের সাথে। সুতরাং মুমিনকে সত্যবাদী হতে হলে তাকে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে শামিল হতে হবে। আল্লাহর আদেশ হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

O ye who believe! fear Allah and be with those who are truthful.

“হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ডয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও।” (সূরা আত তাওবা : ১১৯)

সত্যবাদী তাদেরকে বলা হয়েছে যারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে সততার পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যাদের ব্রহ্মতা ও সুন্দরের মোড়কে আবৃত। আল্লাহর নিকট নবীদের পরেই সত্যবাদীদের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ রাকুন আলামীন ঘোষণা করেছেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْدِينِ أَنَّمَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ التَّبَيِّنِ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

All who obey Allah and the Messenger are in the Company of those on whom is the Grace of Allah, of the prophets, the sincere (lovers of truth), the martyrs, and the Righteous (who do good): Ah: How beautiful is their company.

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন, তারা হলেন- নাবিয়িন, সিদ্দিকীন (সত্যবাদী), শুহাদা ও সালেহীন। বক্তুত তারা কতই উত্তম বক্তু।” (সূরা আন নিসা : ৬৯)

সত্যবাদিতা এমন এক পরিশ পাথর যা মুমিনকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন-

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ
الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا.

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন :

“সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন লোক যখন নিয়তই সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর কাছে সে সিদ্ধিক হিসেবে পরিগণিত হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ সত্যবাদিতা মুমিনের এমন একটি স্বভাব যা তাকে নিয়তই ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। আর ভাল কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। আর যে ব্যক্তি নিয়তই সত্য কথা বলেন, সত্য পথে চলেন, সত্যের পক্ষে অবস্থান নেন, আল্লাহর দরবারে তিনি সিদ্ধিক হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং আল্লাহ তাকে সিদ্ধীকের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। যে ব্যক্তি ফরয, ওয়াজিব আদায় করার পর নিজেকে সত্যবাদীদের কাতারে নিশ্চিত করতে পারবেন, বিশ্বনবী (স.) বলেছেন তাঁর জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمِنُوا إِلَى سَيْئَاتِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمِنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ أَصْدِقُوكُمْ إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوكُمْ إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدْعُوكُمْ إِذَا أُتْهِمْتُمْ وَاحْفَظُوكُمْ فِرُوضَكُمْ وَاعْصُمُوكُمْ أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيكُمْ.

হ্যরত উবাদা বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন :

“তোমরা যদি আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পার, তাহলে আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিতে পারব।

১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে,
২. যখন ওয়াদা করবে তা পালন করবে,
৩. আমানত আদায় করবে।
৪. লজ্জাহানের হেফায়ত করবে,
৫. চোখ সংযত রাখবে এবং
৬. হাত সংযত রাখবে।” (আহমদ, বাযহাকি)

মুমিন হবে আল্লাহর অনুগত বান্দা

অনুগত বান্দার বহিঃপ্রকাশ হলো, سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا (শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম)। আল্লাহ রাবুল আলামীন হ্যরত ইবরাহীম (আ.) কে আদেশ করলেন আস্লিম হ্যরত ইবরাহীম (আ.) এতটুকুও দেরি করলেন না সাথে সাথে বললেন

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম) অর্থাৎ আল্লাহর তায়ালা বললেন মেনে নাও আর অমনিতেই ইবরাহীম (আ.) মেনে নিলেন। একেই বলা হয় অনুগত বান্দা।

চাকর দু'ধরনের হতে পারে, এক ধরনের হলো- অধীনে আছে বিধায় আদেশ মানতে হবে তাই মানে। যেমন- আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা, শায়েবা প্রমুখদের চাকর (দাস)। তাদের চাকরেরা কখনো অনুগত হয়ে তাদের আদেশ নিষেধ মানতো না। বরং অধীনে আছে বিধায় শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে আদেশ-নিষেধ পালন করতো। পালনের ক্ষেত্রে চাকরেরা কোন আজ্ঞাত্তি পেত না এবং মনিবের প্রতি কোন প্রকার ভালোবাসা জন্মাতো না। দ্বিতীয় ধরনের চাকর হলো- অধীনতা নয় বরং মনিবকে সম্পূর্ণ ভালোবেসে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে একান্ত অনুগত হয়ে আদেশ-নিষেধ পালন করে। এক্ষেত্রে কোন রকম অনীহা বা অস্তি আসবে না। নিজের মতো করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে মনিবের হকুমগুলো পালন করবে। যেমন- বিশ্বনবী (স.) এর চাকর হ্যরত আনাস (রা.) দীর্ঘ দশটি বছর রাসূলুল্লাহর (স.) খেদমত করেছিলেন। বিশ্বনবী (স.) দশ বছরে দশবারের জন্যও বলতে হয়নি যে, আনাস এই রকম করেছ কেন অথবা এই রকম করলি কেন? একেই বলা হয় অনুগত চাকর।

অনুরূপভাবে মুমিন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করবে এক্ষেত্রে সে আনন্দ উপভোগ করবে, আল্লাহর হকুমকে সে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করবে না। মুমিন আল্লাহর হকুম মান্য করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে একজন অনুগত বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করবে অর্থাৎ আল্লাহর যেই কোন হকুম কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই পালন করতে হবে। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখনই আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করলেন সন্তানকে যবাই কর অমনিতেই ইবরাহীম (আ.) পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অর্থাত ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা একটি সন্তান দান করলেন। ইবরাহীম (আ.) আপনি তুলতে পারতেন হে আল্লাহ তায়ালা সারা জীবন নিঃসন্তান রেখেছ শেষ বয়সে এনে একটি সন্তান দান করলে আর এখন বলছ তা যবাই করতে, এটি কিভাবে সম্ভব? কিন্তু না তিনি কোন প্রকার আপনি তুলেননি কোন প্রকার প্রশ্ন করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালা আদেশ করলেন আর অমনিতেই তিনি পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অনুগত কাকে বলে? হ্যরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে, শিশুকালেই যখন পুত্রকে তাঁর মা-সহ জন-মানবহীন মরুভূমিতে রেখে আসছিলেন, স্ত্রী জিজেস করলেন হে

ইবরাহীম আমাদেরকে কেন এখানে রেখে যাচ্ছ? হযরত ইবরাহীম (আ.) বাক শক্তি হারিয়ে ফেললেন, কিছুই বলতে পারলেন না। স্ত্রী এবার বুকাতে পেরে প্রশ্ন করলেন— তাহলে কি আল্লাহর আদেশেই আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ? ইবরাহীম আ. শুধু কেবল আঙুল উঁচু করে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, একমাত্র আল্লাহর আদেশেই তোমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছি। স্ত্রী (হাজেরা) বললেন তাহলে তুমি নিচিস্তে চলে যাও, আমি এবং আমার সন্তান এক আল্লাহর উপরই ডরসা করে থাকবো যার আদেশে আমাদের রেখে যাচ্ছ। এটি ছিল ইবরাহীমের স্ত্রীর অনুগত এর বহিঃপ্রকাশ। এবার ছেলের অনুগত হওয়ার ব্যাপারে আমরা জানতে পারি সরাসরি কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে—

فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنْيَ إِنِّي أُرِيَ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا
ئَرَى ۝ قَالَ يَا أَبَتِ افْعُلْ مَا تُؤْمِنْ مُسْتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

Then, when (the son) reached (the age of) (serious) work with him, he said: O my son: have seen in a dream that I offer thee in sacrifice: now see what is thy view! (the son) said O my father! Do as thou art commanded: thou will find me. if Allah so wills one of the steadfast.

“সে পুত্র (ইসমাইল) যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌছলো, তখন (একদিন) ইবরাহীম (আ.) তাকে (পুত্রকে) বলল : হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমকে আমি যবেহ করছি, এখন তুমি বল তোমার রায় কি? সে বললো : হে আব্বাজান! আপনাকে যা হকুম দেয়া হয়েছে তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে আল্লাহ চাহিলে ধৈর্যশীলদের কাতারেই পাবেন।” (সূরা আস সাফাফত : ১০২)

অত্র আয়াত থেকে আমরা ইসমাইল (আ.) এর যে বৈশিষ্ট্যটি পাই তা হলো তিনি সর্বোচ্চ অনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাবা বললেন আমি স্বপ্নে দেখেছি ছেলে বললেন আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হলেন অন্যায়সেই তা পালন করুন। ইসমাইল (আ.) বলতে পারতেন যে, আপনি স্বপ্নে দেখেছেন আর অমনিতে ছেলেকে জবাই করতে চলে আসলেন, এ কেমন পিতা হলেন আপনি? আমি আর আপনাকে বাবা বলে পরিচয় দিব না, আমি চললাম।

কিন্তু না : ব্যতিক্রম হল না। পিতা-মাতার মতই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ.) এর পুরো পরিবারেই আল্লাহর অনুগত পরিবারে পরিণত হলো।

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে বললেন **أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ**. : (বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে আমি আত্মসমর্পণ করলাম), হাজেরা বললেন : আল্লাহর আদেশে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে রেখে যাও, কোন আপত্তি নেই। আমরা আল্লাহর ওপরই ডরসা করে থাকবো। ইসমাইল (আ.) বললেন : আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা আপনি পালন (আমাকে যবাই) করুন। আল্লাহ চাহিলে আমাকে ধৈর্যশীলদের কাতারে পাবেন। আহ! কি কথা, এ কেবল এক জান্নাতি পরিবার। আদিষ্ট হলো আর অমনিতেই সকলে মাথা নত করে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে নিজেদের ইচ্ছাকে বিসর্জন করে দিলেন। বাবা, সন্তান সবই আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিগত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা এরকম পরিবার আমাদের সকলকেই দান করুন। আমীন।

একজন মুমিনকে এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যে, যেখানেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সম্মুখীন হবে সেখানেই মন্তক অবনত করে দিবে। সাময়িক কোন লোকসান দেখা দিলে অনুগতশীলদের সারি থেকে নড়বে না। সে বলবে যেখানেই আমার রবের আদেশ সেখানেই আমার জন্য কল্যাণ অপেক্ষা করছে। সুতরাং পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে তাঁর আনুগত্য থেকে সরাতে পারবে না। সারা পৃথিবী আমার জন্য হয়ে গেলেও সে স্বার্থে একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সারি থেকে সরে দাঁড়াতে পারব না।

মুমিনের জ্ঞান-মাল কেবল আল্লাহর জন্যই বিসর্জন হবে

তাঙ্গত শক্তির মোকাবেলায় সত্যের দাওয়াতের জন্য মুমিনগণ যে চেষ্টা-সাধনা করেন, তা হল জিহাদ। এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধের যয়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। আর এক্ষেত্রে মুমিন আল্লাহর জন্য জীবন নিবে ও দিবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকীর্ণতা থাকতে পারবে না। হয় সে শহীদ হবে অথবা গাজী হয়ে ফিরে আসবে বীরের বেশে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَلِيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. To him who fighteth in the cause of

Allah whether he is slain or gets victory soon shall we give him a reward of great (value)

“তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা আবেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই আমরা তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিব।” (সূরা আন নিসা : ৭৪)

আল্লাহ চাইবেন আর অমনিতেই মুমিন তার জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মোফাসিসের কোরআন বলেছেন, আমার জীবনটা আমার পক্ষে আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই তা আমি বের করে দিব। কেননা এ জীবন মূলত তাঁর নয়, সে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে নিজের জীবনটুকু জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। এ জীবন এখন আর তাঁর নয়, তাঁর হচ্ছে এখন জান্নাত লাভের পালা। মুমিন আল্লাহর পথে নিজের জীবন দিয়ে দিবেন আর অমনিতেই জান্নাতের মালিক হয়ে যাবেন। কেননা সেতো জান্নাত ত্রয় করেছে জীবনের বিনিময়ে। তাঁর কাজ হল চুক্তির আলোকে জীবনকে হস্তান্তর করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ

Allah hath purchased of the Believers their persons and their Garden: they fight in His cause, and slay and are Slain.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ত্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মরে ও মারে।” (সূরা আত তাওবা : ১১১)

ঈমান শুধু একটি প্রাকৃতিক আকিদা-বিশ্বাসের নাম নয় বরং এটি একটি চুক্তির নাম। এ চুক্তির আলোকেই মুমিন তার নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিশ্চয়তা পায় যে, পরকালে পা রাখার পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। আসলে প্রকৃত কথা হলো আমাদের জান আর মালের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলামীন। যিনি আমাদের-সহ ঐ মহাকাশ আর প্রশস্ত যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এবার প্রশ্ন আসে আমাদের জান আর

মাল তাঁকে ক্রয় করতে হবে কেন? এর অর্থ কি? এর উত্তর হলো— মূলত আল্লাহ রাসুল আলামীন আমাদের থেকে আমাদের ইচ্ছাটাকে কিনেছেন অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমরা আমাদের মাল ব্রহ্ম করতে পারব না এবং যেখায় ইচ্ছা সেখায় আমরা আমাদের জান বা জীবন বিসর্জন করে দিতে পারব না। এ জান আর মাল যেহেতু আল্লাহ তায়ালার, সেহেতু এগুলো একমাত্র তাঁর পথেই বা তাঁর ইচ্ছাধীনেই ব্যয় করতে হবে। না হয় জান্নাতের মালিক হওয়া যাবে না। জান্নাতকে নিজের মালিকানায় আনার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে, মুমিন ব্যক্তি কখনো এক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। সে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল তথা ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়ার জন্য। আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই দিয়ে দিবে।

যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে দাবি করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ প্রসংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্ত্রায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরস্মৃত জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কেনা-বেচা এ চৃক্ষি সম্পাদন করে সে মুমিন। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার, যমীন যার বিধান চলবে তার এটাই ন্যায়সঙ্গত কথা। তাই তো আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সবখানেই আল্লাহর হুকুমই বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহর তৈরী সৃষ্টি জগতের শুধুমাত্র মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনতা দান করেছেন, আর তারাই গোলমাল বাঁধায় তারা নিজেদের ও শয়তানের মনগড়া আইন দ্বারা সমাজ চালাতে চেষ্টা করে এবং চালায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

Do they seek for other than the Religion of Allah? while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, bowed to His will (accepted Islam), and to Him shall they all be brought back.

“তারা (মানুষেরা) কি আমার আনুগত্য (বিধান) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পক্ষ (বিধান) গ্রহণ করতে চায়? অথচ ঐ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার আনুগত্যের কাছে তারা মাথা নত করে দিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।” (সূরা আল ইমরান : ৮৩)

আর যারা হেদায়াত প্রাণ হয় তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রাবুল আলামীন মানুষের জন্য যে জীবন বিধান (আল কোরআন) দিয়েছেন সেই বিধান মতো সমাজকে পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করে। যার ফলে খোদাদ্বোধীদের দ্বারা বাধাপ্রাণ হয় এবং মুমিন ও খোদাদ্বোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়, মুমিনরা এক্ষেত্রে সীসা ঢালা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে খোদাদ্বোধীদের আক্রমণের জবাব দেয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে প্রয়োজন হলে নিজের জীবনটুকু মহান আল্লাহর জন্যই কোরবান করে দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহর রাবুল আলামীনের কাছ থেকে জান্মাত বুঝে নেয়।

মুমিন হবে তাওবাকারী

মুমিনদের যে অপরিহার্য শুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম শুণ হবে : যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যাবে তখনই তওবা করে ফিরে আসতে হবে। নিজের সত্য বিচ্যুতির ওপর অবিচল থাকা যাবে না। মানুষের দিনান্তিপাতের মধ্য দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, পরিবেশের কারণে বা শয়তানের প্ররোচনায় শুনাহের কাজ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অপরাধ হয়ে যেতেই পারে। আর শুনাহ করলে তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে, কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি হবে, কতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি হবে, ইসলামী শরিয়াতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সর্বক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর রাবুল আলামীনের নির্ধারিত সে শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ও পাথেয় হলো তওবা করে ফিরে আসা।

তওবা শব্দের অর্থ রঞ্জু করা বা ফিরে আসা, বিরত থাকা, বঙ্গ করে দেয়া, মুছে ফেলা ইত্যাদি। যারা তওবা করে তাদেরকে তায়ের বলা হয় অর্থাৎ শুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ তায়ালার শুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো

الْتَّوَابُ বা ক্লজুকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এলো, আল্লাহ তায়ালা তার দিকে অধিকতর ক্লজুকারী হবেন বা তার দিকে আল্লাহ তায়ালা অতিদ্রুত এগিয়ে আসবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

If anyone does evil or wrongs his own soul but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft-forgiving, Most Merciful.

যে ব্যক্তি শুনাহের কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে, অতঃপর এজন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীবও দয়ালু হিসেবে পাবে।” (সূরা আন নিসা : ১১০)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

হ্যরত আগার ইবনে ইয়াসার মুয়াল্লী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা, আমি দৈনিক একশতবার (১০০) তওবা করি।” (মুসলিম)

গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে না, অনুশোচনা করে না, অনুতঙ্গ হয় না, বরং অবলীলাক্রমে একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে। এমনকি একপর্যায়ে এসে এখন আর অপরাধকে অপরাধ বলে মনে হয় না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং সে আর মুসিনদের কাতারে থাকে না। এই জন্যে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কখনো গুনাহ করে বসলে অবশ্যই চোখের পানি ফেলে তওবা করতে হবে এবং গুনাহ মাফ চাইতে হবে। আর যারাই গুনাহ করার পর ক্ষমা চাইবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাৰ পক্ষ থেকে বিশাল জান্মাতের সু-সংবাদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

Be quick in the race for forgiveness from your Lord and for a Garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous.

“দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশংস্ত জান্মাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা আল্লাহভীরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।” (সূরা আল ইমরান : ১৩৩)

আল্লাহর রাসূলের আমলে ইজদ গোত্রের একজন ঈমানদার নারী নফসের খোকায় পড়ে অবৈধ পছায় ঘোনক্রিয়া করেছিল। অনুশোচনা ফিরে পাওয়া মাত্র আল্লাহর ভয়ে সেই নারীর হৃদয় থর থর করে কেঁপে উঠলো। আহার-নিদ্রা সব তার বক্ষ হয়ে গেল। কিয়ামতের ময়দানে আপন রবের সামনে সে কোন মুখ নিয়ে উঠবে? এ ভয়ে ছুটে আসলো রাসূলের (স.) কাছে এবং নির্দিষ্টায় নিজের অপরাধের বর্ণনা দিলো। রাসূল (স.) তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সেই নারী তার প্রতি দণ্ডরোপ করার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে বার বার আবেদন জানাতে লাগলো। অবশেষে রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ঘোন ক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কি গর্ভবতী হয়েছ? অনুত্তাপের সাথে নারী জানালো সে গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স.) মহিলাকে বললেন : গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আক্ষেপ করতে করতে মহিলাটি চলে গেলো। সমানিত মুমিন ভাই ও বোনেরা, ভালোভাবে একটু চিন্তা করুন মহিলাটিকে প্রহরা দেয়ার জন্য বিশ্বনবী (স.) কোন প্রকার প্রহরী বা গোয়েন্দা নিয়োগ করেননি। দশ মাস পর সন্তান প্রসব হলো কিন্তু সেই নারীর মন থেকে অনুত্তাপের মাত্র সামান্য পরিমাণও হ্রাস পায়নি। সন্তান কোলে করে মহিলাটি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে পুনরায় দণ্ড প্রয়োগের আবেদন করলেন। রাসূল (স.) বললেন : তোমার দুধে ঐ সন্তানের দুই বছর হক রয়েছে। সেই হক তুমি আদায় করবে এবং সন্তান অন্য কিছু আহরণ না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মহিলাটির দুই গুণ বেয়ে অনুত্তাপের অঞ্চল পড়ছে। চলে গেল সে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানটিকে রূটি খাওয়া অবস্থায় এনে রাসূলকে দেখিয়ে আবেদন জানালো ‘হে আল্লাহর রাসূল (স.) আমার সন্তান দুধ খাওয়া ত্যাগ করেছে এই দেখুন ছেলেটি রূটি খাচ্ছে।’ রাসূল (স.) উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে এই সন্তানকে লালন পালনের দায়িত্বাত্মক গ্রহণ করবে? একজন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। রাসূল (স.) ঐ লোকটির দায়িত্বে সন্তানটিকে দিয়ে সেই মহিলাটিকে বক্ষ পরিমাণ মাটিতে গেঁড়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

হ্যরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় একটি পাথরের আঘাত করলেন, মন্তক ফেটে মগজ আর রক্ত ছিটকে এসে হ্যরত খালিদ ইবনে অলীদের দেহ স্পর্শ করলো, তিনি মহিলার প্রতি জর্জসনা করলেন। আল্লাহর রাসূল (স.) তা শনে উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন : “তোমরা যদি পৃথিবীতে কোন জান্নাতি নারী দেখতে চাও, তাহলে এই নারীকে দেখে নাও। কারণ সে এমনভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন” মুমিন এভাবেই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে অপরাধ থেকে তওবা করে ফিরে আসে আর তওবা করা হচ্ছে ঈমানের দাবি।

মুমিন হবে ইবাদতকারী

বিশ্বনবী সাইয়েদেনা মুহাম্মদ (স.) যখন বঙ্গুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎরগমন করলেন তখন বঙ্গুর পরিচালনার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় মূলনীতি দান করেছিলেন। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান মূলনীতি হলো—

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ.

Thy Lord hath decreed that ye worship none but Him.

“তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।” (সূরা বনী ইসরাইল : ২৩)

একথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়, কারো না কারো সামনে মাথা নত করতে চায়। মানুষ ক্ষুধা লাগলে যেমন খাবারের আশ্রয় গ্রহণ করে, অসুস্থ হলে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে, ঝাউ-শ্বাস হলে বিশ্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, বৃষ্টির শিকার হলে ছাউনির আশ্রয় গ্রহণ করে। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে যখনই বন্দেগীর অনুভূতি জাগ্রত হয়, তখন সে কারো না কারো সামনে মাথা নত করে থাকে। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারী হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়। মনস্তৃবিদগ্ন গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের মনই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়, যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নত করে দিতে চায়।

তবে এক্ষেত্রে মুমিন একমাত্র মহাপ্রাক্রমণালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের কাছে নিজেকে সপে দিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথা নত করবে। কেবলমাত্র

তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করবে। কেননা মুমিন অস্তর দৃষ্টি ধারা দেখতে পায় সৃষ্টি জগতের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ রাকুন আলামীনের ইবাদত করছে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বিষয়টিকে **تَسْبِيحٌ** শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।
سَبْحَنَ اللَّهُ أَكْبَرُ —
تَسْبِيحٌ অর্থাৎ, তাসবীহ পড়ছে, তাসবীহ পড়ছে এবং তাসবীহ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাসবীহ ও ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحةَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

The seven heavens and the earth, and all beings therein, declare His glory: there is not a things but celebrates His praise, and yet ye understand not how they declare His glory! verily He is oft-forbearing, Most forgiving!

“সাত আকাশ আর যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না। নিচয়ই তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।” (সূরা বনী ইসরাইল : ৪৮)

আল্লাহর সৃষ্টি চন্দ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা, সাগর-নদী, আলো-বাতাস, পর্বত-ঝর্ণা ইত্যাদি সবই তাঁরই বন্দেগী বা আনুগত্য করছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন—

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ — وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُانِ.

The sun and the moon follow courses (exactly) computed. And the herbs and the trees-both (alike) bow in adoration.

“চন্দ-সূর্য সবই (যার যার অবস্থানে) পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহকে সেজদা করছে। (সূরা আর রহমান : ৫-৬)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَتَعْوِنُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

Do they seek for other than the Religion of Allah? While all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, boarded to His will (accepted Islam), and to Him shall they all be brought back.

“তারা (মানুষেরা) কি আমার আনুগত্য (বিধান) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পছন্দ (বিধান) গ্রহণ করতে চায়? অথচ ঐ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার আনুগত্যের কাছে তারা মাথা নত করে দিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।” (সূরা আল ইমরান : ৮৩)

হযরত ইউনুস (আ.) ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি জীবিত থাকবেন আশা ছিল না। কিন্তু রাখিলে আল্লাহ মারিবে কে। মাছ স্বাভাবিক হজম শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। বিশাল আকৃতির মাছ হযরত ইউনুস (আ.) কে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিলো। তিনি মাছের পেটে গভীর অঙ্ককারে অবস্থান করে শুনতে পেশেন- সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের সুন্দর বালুকগা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহর নামের যিকিরি করছে। হযরত ইউনুস (আ.) তা শুনে অবাক হয়ে বলতে শাগলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

There is no god but thou: glory to thee: I was indeed wrong!

“তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সন্তা, অবশ্যই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আল আমিয়া : ৮৭)

আল্লাহর ইবাদত মানব প্রকৃতির একান্তিক দাবি। কেননা, বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তা আল্লাহ রাকবুল আলায়ানই হলেন আসল মাঝুদ বা ইবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক। পবিত্র কোরআন বলছে-

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَارِقِ .

Verily, Verily, your God is one: Lord of the heavens and of the earth, and all between them, and Lord of every point at the rising of the sun!

“তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই- যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এবং এর উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর রব বা প্রতিপালক এবং সমস্ত উদয়স্থলের প্রতিপালক।” (সূরা আস সাফকাত : ৪-৫)

অর্থাৎ আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে মাবুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিত। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবেন একজন আর ইলাহ (ইবাদত লাভের অধিকারী) হবেন আরেকজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ-ক্ষতি, অভাব-প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, ভাগ্য, ভাঙ্গা-গড়া এবং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বে যার ক্ষমার অধীনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁর সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবি। এটিই তার ইবাদতের মূল কারণ।

একজন মানুষ যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের উপর মুমিন হয় তখন সে এ. দাবিশুলো উপলক্ষ্মি করতে পারে। তাই সে প্রতিনিয়ত একমাত্র, শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ রাবুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে দিনান্তিপাত করে। মুমিন প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের পূর্বে চিন্তা করে এটি কি আমার আল্লাহর গোলামীর শামিল হবে? এর মধ্যে কি আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে? মুমিন নিজেকে এমন নিয়মে পরিচালনা করবে যে, প্রতিটি নিয়মই হবে তার জন্য একেকটি ইবাদত। ব্যবসা করতে যাবে সেটি হবে ইবাদত, রাজনীতি করতে যাবে সেটি হবে ইবাদত। খেতে যাবে, ঘূমাতে যাবে, কাউকে ভালোবাসবে অথবা ঘৃণা করবে, দান করবে অথবা দান থেকে বিরত থাকবে সবই হবে ইবাদত অর্থাৎ মুমিনের পুরো জীবনটাই হবে ইবাদত, ইবাদত ছাড়া মুমিনের একটি কদমও পড়বে না চলার পথে। যার ফলে সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালের চিরস্থায়ী ও চির মহাসুখের স্থান জান্মাত লাভ করবে।

মুমিন মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে তার পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। কেননা, মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কোরআন্ত কারীম তার বাস্তব সাক্ষী-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

I have only created jenns and men, that they may serve Me.

“আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি”। (সূরা আয যারিয়াত : ৫৬)

সুতরাং প্রতিটি মুমিন আনুগত্যের মন্তক অবনত করে দিবে একমাত্র সেই মহান আল্লাহর সামনে- যিনি সৃষ্টি জগতের পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপর বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমনিভাবে বান্দার ওপর আল্লাহর হক বিদ্যমান। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (স.) বলেছেন : বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিনে হিসাব নিকাশের পর আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়ে জাহান্নাম দান করবেন।

মুমিন হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী

সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। একথা বলে সৃষ্টির প্রশংসা করার মূলে কৃঠারাঘাত করা হয়েছে, কেননা ইংরেজী ভাষায় যেমন বাক্যের (Sentence) শুরুতে The শব্দটি আসলে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সে বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তেমনিভাবে আরবী ভাষায় বাক্যের (مُكَلَّف) শুরুতে ل (আলিফ-লাম) আসলে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সে বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। سُورা فاتحَةَ الْحَمْدِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এর অর্থমে ل (আলিফ-লাম) যোগ করে পৃথিবীতে প্রশংসা বলতে র্যা বুকায় সবই মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রশংসা হবে একমাত্র, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র সুষ্ঠার জন্য কোন সৃষ্টির জন্য নয়।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করবো আর বলবো আল্লাহ কতই না সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, নিজ সন্তানের প্রতি তাকাবো আর বলবো **الْحَمْدُ لِلّهِ** (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), নিজ যোগ্যতার প্রতি এবং সফলতার প্রতি লক্ষ্য করবো আর বলবো **الْحَمْدُ لِلّهِ** (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। সুন্দর বা ভালো জ্ঞানে পেলে প্রশংসা করতে হবে আল্লাহর। কেননা পৃথিবীর যেখানে যে জিনিসের মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিবরাজমান আছে, আল্লাহর কর্তৃত্বই মূলত তার একমাত্র উৎস। কাজেই একজন মুমিন কোন সৃষ্টিরই প্রশংসা করতে পারে না একমাত্র আল্লাহর ছাড়া। সে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করবে। জীবনের প্রতিটি সফলতায় মুমিন একমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব খুঁজে পাবে। সমাজে সম্মানজনক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, ব্যবসায় সফলতা, ফসলে লাভজনক উৎপাদন, শারীরিক সুস্থিতা, জ্ঞানের ভারসাম্যতা- মুমিন মনে করে এসবই আল্লাহ রাবুল আলামীনেরই করণা, অনুভাব বা দান, এ সকল সফলতার

পেছনে সে অন্য কোন উৎস খুঁজে পাবে না এবং খোজার চেষ্টাও করবে না। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা উঠো-বসায়, শয়নে-চলনে, গ্রহণে-বর্জনে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর রাক্তুল আলামীনের প্রশংসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

মনে রাখতে হবে যে, মুমিন আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর প্রতি ইহসান করে না বরং সে আল্লাহর প্রশংসা করবে এটি হল তাঁর নিকট আল্লাহর অধিকার। শুধু তাই নয়, মুমিন একাই আল্লাহর প্রশংসা করবে বিষয়টি মোটেও এমন নয় বরং আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর প্রশংসায় মন্ত। পবিত্র কোরআনুল কারীম তাঁর বাস্তব প্রমাণ-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

The seven heavens and the earth, and all beings therein, declare his glory: there is not a thing but celebrates His praise, and yet ye understand not how they declare His glory! verily He is oft forbearing, Most forgiving!

“সাত আকাশ আর যমীন এবং তাঁর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে, এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-ত্বতির সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না। নিচয়ই তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।” (সূরা বনী ইসরাইল : ৪৮)

প্রত্যেকটি প্রাণী থেকে শুরু করে বস্তু পর্যন্ত কেবলমাত্র নিজের রবের দোষ-ক্রটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার কথাই প্রকাশ করছে না বরং এই সংগে তাঁর যাবতীয় শুণে শুণান্বিত ও প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বর্ণনা করছে। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে একথা প্রকাশ করছে যে, তাঁর স্তো ও ব্যবস্থাপক এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ শুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পৃত অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি থেকে থাকে তাহলে একমাত্র তাঁরই জন্য আছে।

সুতরাং প্রত্যেকটি মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে হবে কোন কাজের সূচনায় ও সমাপ্তিতে সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করা যিনি তাকে ঐ কাজটি শুরু ও শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন। নিজের দেহ থেকে শুরু করে সৃষ্টির যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সেদিকেই সে মহান আল্লাহর করুণার প্রকাশ ঘটতে দেখে

ব্রহ্মকৃতভাবে তার কষ্ট থেকে মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নেয়ামত ব্যবহার-ভোগ করার সময় মুমিন আল্লাহর প্রশংসা করবে। জীবনের প্রত্যেকটি সময় অতিবাহিত করার সময় কিভাবে দয়াবান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নেতা বিশ্বনবী (স.) শিখিয়ে গিয়েছেন। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া, পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করা, নতুন বস্ত্র পরিধান করা, পাদুকা পরিধান করা, আয়নায় নিজের চেহারা দেখা, কোথাও রাওয়ানা করা, বাজারে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, আহার গ্রহণ করা, আহার শেষ করা, স্তু সহবাস করা ইত্যাদি কাজের সময় রাসূল (স.) নানা ধরনের দোয়ার মাধ্যমে মহাপ্রাক্রমণশালী দয়াবান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতেন। মুমিন প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয় রাসূলের (স.) শেখানো দোয়াগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় নিজেকে ব্যস্ত রাখবে।

মুমিন আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ করে

পবিত্র কোরআনে যমীনে বিচরণকারী বুরানোর জন্য **السَّائِحُونَ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর অর্থ শুধু ঘূরফেরা করা বুরানো হয়নি। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে ভ্রমণ করা যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। পৃথিবীতে ঘূরবে, চলা-ফেরা করবে আর আল্লাহর নিদর্শনের জ্ঞান অর্জন করবে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে এবং তাঁর পরিচয় মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। ধীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত এলাকা থেকে সাময়িক হিজরত করা, ধীনের দাওয়াত দেওয়া, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা অর্জন করার জন্য বের হওয়াই হলো, **السَّائِحُونَ** এর অর্থ।

মুমিন জীবনের প্রথম এবং প্রধান কাজই হল সর্বদা সে এক আল্লাহর বন্দেগী করবে, তাঁর হকুম মেনে চলবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে যদি কোন জুখওঁে পরিবেশ পরিস্থিতি আল্লাহর হকুম পালনের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহর ইবাদত বা হকুম পালন করার সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে মুমিন ইবাদত পালনের প্রতিকূল জায়গা থেকে অনুকূল জায়গায় হিজরত করবে। তবুও পরিবেশ-পরিস্থিতির অজুহাতে আল্লাহর ইবাদত বা হকুম পালন করা থেকে দূরে থাকা যাবে না। হিজরত অর্থ আল্লাহর জন্য সম্পর্কইন হয়ে যাওয়া। ঐসব

জিনিস থেকে মুমিনের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত যেগুলো আল্লাহর ভালোবাসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঢ়ায়। হোক সেটি মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, আজীয়-স্বজন, কর্তৃ-ক্রমতা কিংবা জন্মভূমি। মহান আল্লাহর ইবাদতকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা করার দরকার তাই করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ হলো-

يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُوْنِ.

O My servants who believe truly, spacious is My Earth therefore serve ye Me (and me alone).

“হে আমার ইবাদতকারী মুমিন বান্দাগণ! আমার যমীন বেশ প্রশংসন, কাজেই তোমরা (যে যেখানেই সুযোগ পাও সেখানেই) আমার ইবাদত কর।” (সূরা আল আনকাবৃত: ৫৬)

মুসলিম জাতির জনক হ্যরত ইবরাহীম (আ.) এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। কিন্তু যখনই তাঁর পিতা ‘আয়র’ তাঁর ইবাদতের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঢ়ায় তখনই তিনি যমীনে বিচরণ করে হলেও এক আল্লাহর ইবাদত করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ রাবুল আলামীন বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্যাটিকে কোরআনুল কারীমে কোড করে দিয়েছেন-

يَا أَبْتِ إِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَبْغُنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا —
يَا أَبْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا — يَا أَبْتِ إِنِّيْ
أَخَافُ أَنْ يَمْسِكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا — قَالَ أَرَاغِبُ
أَنْتَ عَنِ الْهَتِّيْ يَا إِبْرَاهِيمُ لِئِنْ لَمْ تَتَّهِ لَأَرْجُمَنِكَ وَاهْفَرْنِيْ مَلِيًّا — قَالَ
سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ مِنْ إِلَهٍ كَانَ بِيْ حَفِيًّا — وَأَعْتَزِ لَكُمْ وَمَا
تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّيْ عَسَى أَلَا كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَفِيًّا.

O my father! to me hath come knowledge which hath not reached thee: So follow me: I will guide thee to a way that is even and straight. O my father! serve not satan for satan is a rebel against (Allah) Most Gracious. O my father! fear lest a chastisement afflict thee from (Allah) Most Gracious so that

thou become to satan afriend. (The father) replied: aft thou shrinking from my gods, O Abraham? If thou forbear not, I will indeed stone thee: now get away from me for a good long while! Abraham said: peace be on thee: I will pray to my Lord for they forgiveness: for He is to me Most Gracious.

And I will turn away from you (all) and from those whom ye invoke besides Allah: I will call on my Lord perhaps, by my prayer to my Lord I shall be not unblest.

“হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, তাই আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো। হে পিতা! শয়তানের বন্দেগী করবেন না, অবশ্যই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় দয়াময়ের কোন শান্তি না আপনার ওপর এসে পড়ে, তখন আপনি শয়তানের দলে পড়ে যাবেন। পিতা বললো- হে ইবরাহীম তুমি কি আমার উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, পাথর নিক্ষেপে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি আমার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ.) বললেন- আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য প্রার্থনা করবো। অবশ্যই তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাকেন তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকবো। আশা করি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঝিত হবো না।” (সূরা মারইয়াম : ৪৩-৪৮)

বেঙ্গলুন-মুনাফিকরা দেশ ভ্রমণ করে নিছক ভোগ-বিলাসের পরিধি বিস্তৃতির লক্ষ্যে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে, আনন্দ-ফূর্তি লাভ, স্বাস্থ্য পরিবর্তন, দেহ ও মনের বাসনা-কামনা পূরণ ইত্যাদি বৈষম্যিক উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাগণ বিশেষভাবে পাঁচটি উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে থাকে। যেমন-

এক. আল্লাহর নির্দর্শনাবলী অবলোকনের উদ্দেশ্যে

মহামহিয়ান আল্লাহ রাকুল আলামীন গোটা পৃথিবীতে অসংখ্য নির্দর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। মুমিনরা তা ঘুরে ঘুরে অবলোকন করে আর আল্লাহর প্রতি ইমানকে মজবুত করে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছে এবং ধৰ্ম হয়েছে, মুমিনরা সেসব ধর্মস্তুপ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে

দেশ ভ্রমণ করে থাকে। আর তা অবশ্যিকনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্দেশ করেছেন-

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنَّ سَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ — هَذَا يَبْيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوَعِّظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.

There have been examples that have passed away before you travel through the earth, and see what was the end of those who rejected truth. Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah.

“তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।” (সূরা আল ইমরান : ১৩৭-১৩৮)

দুই. তিনটি ঘর যিয়ারতে উদ্দেশ্যে

কোন মানুষ যদি কোন দেশ বা অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাহলে সেখানে অবস্থিত কারো কবর সে যিয়ারত করতে পারে কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর এই ভূমণ্ডল এর অধিকাংশ মুসলিম দেশ এবং অনেক অমুসলিম দেশে আল্লাহ তায়ালার ওলী, বুর্যুর্গ বা সালেহীনদের কবর রয়েছে। মানুষ যখন সেসব দেশে কোন কারণে যাবে, তখন তাদের কবর যিয়ারত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এককভাবে হোক অথবা দলবদ্ধভাবে হোক ভ্রমণে বের হওয়া যাবে না, এই পৃথিবীতে তিনটি ঘর ব্যতিত অন্য কোন ঘর বা মাজার যিয়ারতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় বা সওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা যাবে না। সে তিনটি ঘর সম্পর্কে রাস্তা (স.) স্পষ্ট ভাষণ দিয়েছেন-

لَا تَشْدُدُ الرُّحَالُ إِلَى أَنْتَلَةٍ مَسَاجِدُ الْحَرَمِ وَمَسَاجِدُ هَذَا وَالْمَسَاجِدُ الْأَقْصَى.

“মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশায় ভ্রমণ শুধুমাত্র তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো- ১. মসজিদে হারাম, ২. আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ৩. মসজিদে আকসা। এছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন স্থাপনে ভ্রমণ করবেনা।” (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি, জীবন প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে

জীবন মানে হলো জীবন ব্যবস্থা বা জীবন চলার পদ্ধতি। যে ব্যবস্থা বা পদ্ধতি মানব সম্প্রদায়ের জন্য। এ মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন এক আল্লাহর তায়ালা। আর এ মানব সম্প্রদায় শুধু নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা দেশে বসবাস করছে না। বরং সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষের বসবাস। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট জীবন ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রাকুল আলামীনই করেছেন। সুতরাং তাঁর রচিত জীবন ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে বসবাসরত সকল মানুষকে মেনে চলতে হবে। কারণ হল আল্লাহর তায়ালা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর জন্য এ জীবন ব্যবস্থা তৈরী করেননি বরং করেছেন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য। আল্লাহর তায়ালাই ঘোষণা করছেন-

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ بِفِهْدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

Those were the (Prophets) who received Allah's guidance. Follow the guidance they received, say : No reward for this do I ask of you : this is but a Reminder to the nations.

“(হে মুহাম্মদ) তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটিই (কোরআনুল কারিম) সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।” (সূরা আল আনআম : ৯০)

সুতরাং সারা দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর তায়ালা যে উপদেশ প্রদান করেছেন সে উপদেশ দেশ-দেশান্তরে পৌঁছানোর জন্য মুমিন বিশ্ব ভ্রমণ করবে। রাসূল (স.) এর নির্দেশ হলো-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغُوا عَنِي وَلَوْ أَيَةً وَحَدُّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَرَّأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ (بخاري)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : একটি আয়াত (বাক) হলো তা আমার পক্ষ্য থেকে (মানুষের কাছে)

পৌছে দাও। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা করো তাতে কোন দোষ নেই, আর যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (জাল হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (বুখারী)

আল্লাহর বিশাল-বিস্তৃত এ পৃথিবীর অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে এখনো আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের উপদেশাবলী সঠিকভাবে পৌছেনি অথবা পৌছলেও তারা ভুলে বসেছে। দ্বিনের দাওয়াত সেখানে প্রচার ও প্রসার নেই। মুমিন এতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর প্রশস্ত ভূমগলে ভ্রমণ করবে।

চার. দ্বিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য

ইসলাম নতুন করে যাত্রা শুরু করেছিল জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ রাবুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথে কথা শুরু করেছিলেন পড়ার উপদেশ দিয়ে। তিনি বললেন-

اَقِرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَصْفَنِ.

Proclaim! (Read) in the name of thy Lord and Cherisher, who created. Created man, out of a leechlike clot.

“(হে রাসূল) পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাধা রক্ষের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আল আলাক : ১-২)

শুধু তাই নয় আল্লাহ তায়ালা মানব সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু করেছিলেন জ্ঞান শিখানোর মধ্য দিয়ে। আল্লাহ বলেন-

وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَئْتُشُرِّنِي بِأَسْمَاءٍ
هُوَلَاءِ إِنْ كُشِّمْ صَادِقِينَ.

And He taught Adam the names of all things then He placed them before the angels, and said Tell Me the names of these if ye are right.

“আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম কি?” (সূরা আল বাকারা : ৩১)

আল্লাহর রাকুন আলামীন হ্যরত আদম (আ.) কে জ্ঞান শিখিয়ে দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত যারাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন তারাই সমসাময়িক সমাজের সবচাইতে মর্যাদার অধিকারী হবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

أَئِنْ هُوَ قَائِمٌ بِآنَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
فَلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

Is one who worships devoutly during the hours of the night prostrating himself or standing, who takes heed of the Hereafter, and who places his hope in the Mercy of his Lord. (like one who does not)? Say: Are those equal, those who know and those who do not know? It is those who are endued with understanding that receive admonition.

(এ ব্যক্তির আচরণ সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সেজনা করে, আবেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরম্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা আয় যুমার : ৯)

সুতরাং মুমিনের দেশ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান আহরণ করা। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া আর জিহাদের জন্য বের হওয়ার মর্যাদার সমান। রাসূল (স.) এর হাদীসে এসেছে-

وَعَنْ أَئِسِ (رض) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ.

হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি জ্ঞান অস্ত্বের উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে।” (তিরমিয়ী)।

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمٌ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَغَيَّرُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُّ أَجْنِحَتَهَا. (ترمذی)

হ্যরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি জ্ঞান অঙ্গের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহর তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অঙ্গের কারীগণের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন।” (তিরমিয়ী)

পাঁচ. হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্য

নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-গোষণ দেয়া, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করা এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য মুমিন অধিক হালাল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে দেশ সফর করবে এতে কোন বাধা নেই। ইসলাম এর জন্য অনুমোদন দিয়েছে। পবিত্র কোরআনুল কারীম তার বাস্তব প্রমাণ-

عِلْمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ ۝ وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَغَيَّرُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ ۝ وَآخَرُونَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

He knoweth that there many be (some) among you in ill-health, others travelling through the land, Seeking of Allah's bounty, yet others fighting in Allah's Cause.

“তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সঞ্চানে ভ্রমণরত এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।” (সূরা আল মুয়াম্বিল : ২০)

হালাল ও বৈধ উপায়ে কুরজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অনুসঙ্গান বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামে বৈধ পছায় অর্থ উপার্জন করা বড় ধরনের মর্যাদার কাজ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য রোজগারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে এবং সে দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।” (ইবনে মারদুইয়া)

মুমিন রূক্তুকারীদের সাথেই রূক্তু করে

পৃথিবীতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সিদ্ধিকীন, সালেহীন যারাই এসেছিলেন, কেউই নিজে নিজে একাকীভাবে আল্লাহর হৃকুম পালন করেননি। বরং দলবদ্ধভাবেই মহান স্টাট আল্লাহর রাবুল আলামীনের হৃকুম পালন করেছেন। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করেছেন। এই জন্যেই বিশ্ববী (স.) মদিনায় হিজরত করে প্রথমেই মসজিদ তৈরি করলেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহকে মুয়ায়খিন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। হযরত বিলাল (রা.) দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতেন। আর সকল মুমিনগণ দলে দলে এসে একত্রিত হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহর সামনে দলবদ্ধভাবে মাথা নত করতে লাগলেন অর্থাৎ রাসূলের সাথে রূক্তু ও সেজদা দিতে লাগলেন। একপর্যায়ে এসে, দলবদ্ধভাবেই আল্লাহর সামনে মাথা নত করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ এসে যায়। পবিত্র কোরআনুল কারীম তাঁর সাক্ষী-

وَأْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَوةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

And be steadfast in prayer: give Zakat, and bow down your heads with those who bow down (in worship).

“নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে মাথা অবনত (রূক্তু) করে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হয়ে যাও।” (সূরা আল বাকারা : ৪৩)

আল্লাহর সামনে রূক্তু ও সেজদা করা প্রত্যেক যুগেই দ্বীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্থীরূপ হয়ে এসেছে। অন্যান্য নবী রাসূলদের ন্যায় বনী ইসরাইলদের নবী-রাসূলগণও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে বেশির ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর এটাই স্বাভাবিক যে, সামষ্টিক কোন বিষয় যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তাহলে এক পর্যায়ে তা বিলীন হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহর রাবুল আলামীন তাঁর মুমিন বান্দাদের বলেছেন যে, তোমরা রূক্তুকারীদের সাথে রূক্তু করো অর্থাৎ জামায়াতে নামায আদায় করো।

আল্লাহর নবী (স.) যখন মৃত্যু শয্যায়, কখনো ছঁশ কখনো বেঁশ। হযরত

আয়েশার কোলে নবীজীর (স.) মাথা। জ্ঞান ফিরে এলো নবীজীর। বললেন- এখন কোন সময়? হ্যরত আয়েশা বললেন, নামাযের জামায়াতের সময় হয়ে গেছে। আপনার সাহাবীগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমার বাবার ইয়ামতিতে নামায ওরু করলেন। বিশ্বনবী (স.) বললেন, আয়েশারে আমার মাথাটা একটু উঁচু করে ধরো। হ্যরত আয়েশা (রা.) আদেশ মতো নবীজীর মাথা উঁচু করে ধরলেন। দোজাহানের বাদশাহ (স.) খেজুর পাতার বেড়ার উপর দিয়ে সাহাবীদের নামাযের জামায়াতের দৃশ্য অবলোকন করলেন। নামাযের দৃশ্য দেখার পর বললেন, আয়েশারে এবার আমার মাথাটা আগের মতো করে রাখ। হ্যরত আয়েশা (রা.) আগের মতোই নিজের উরুর ওপর বিশ্বনবীর মাথা রেখে ওয়ে দিলেন। হ্যরত আয়েশা (রা.) দেখতে পেলেন নবীজীর দু'চোখের কোণা দিয়ে পানি বেয়ে বেয়ে পড়ছে। হ্যরত আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি কাঁদছেন কেন? নবীজী বললেন : আয়েশারে! এটি কোন দুঃখের কান্না নয় বরং তৃষ্ণির কান্না। যে জামায়াতের জন্য আমি তায়েকের ময়দানে রক্তাঙ্গ হয়েছি, যে জন্য আমাকে দস্ত হারাতে হয়েছে। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অনুপস্থিতিতেও আমার সাহাবীরা সেই নামায আদায় করছে। এই দেখে আমার আজ্ঞাবিশ্বাস জন্মেছে- কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতরা নামাযের জামায়াতকে সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

একজন মুমিনের হৃদয় সর্বদা মসজিদের সাথে মিশে থাকবে। যখনই নামাযের সময় হয়, মুয়ায়ফিন বলেন (নামাযের দিকে এসো) তখনই মুমিন পার্থিব জীবনের সকল ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে মাথা নতকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। সে সর্বদা সজাগ থাকে মানসিকভাবে, না জানি কখন আমার নামাযের জামায়াত ছুটে যায়। মুমিন এক ওয়াক্তের পর পরবর্তী ওয়াক্তের (জামায়াতের) জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা রূক্হকারীদের সাথে রূক্হকারী মুমিনদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন। বিষয়টি হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعاً قَدْ حَفَزَةَ النَّفْسِ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُقْبَتِهِ فَقَالَ : أَبْرُوا هَذَا رُبُكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ وَيَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ — يَقُولُ انْظِرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضُوا فِرِيزَةَ وَهُمْ يَتَنَظَّرُونَ أَخْرَى —

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : একদা আমরা রাসূল (স.) এর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। অতঃপর যারা চলে যাবার তারা চলে গেলেন, আর যারা অপেক্ষা করার তারা মসজিদে থেকে গেলেন। এমন সময় রাসূল (স.) উর্খর্শাসে দ্রুত মসজিদ পানে ছুটে এলেন। দ্রুতবেগে আসার কাবণে তার হাঁটু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি এসে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের রব আকাশে একটি (রহমত ও বরকতের তৈরি) দরজা খুলে দিয়েছেন। তোমাদের প্রশংসা করে তিনি ফেরেশতাদের বলছেন : দেখো। আমার বান্দাদের, যারা একটি ফরয আদায় করে আরেকটি ফরযের অপেক্ষায় রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

মুসিন ব্যক্তি যখন মসজিদে জামায়াতের জন্য যাতায়াত করবে আর আসা-যাওয়ার পথে অন্য যেই কোন জল্লনা-কল্লনা করবে, পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, পরিকল্পনা-কর্মসূচী ছিল করবে, আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু তাঁর আমলনামায লিপিবদ্ধ করিয়ে দেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَفْسَارِ لَا يَعْلَمُ
أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَائِنٍ لَا تَخْطُطُهُ صَلَةٌ فَقِيلَ لَهُ لَوْ اشْتَرَتْ
حَمَارًا تَرْمِكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمَضَاءِ فَقَالَ مَا يَسْرُ فِي أَنْ مَنْزِلِي إِلَى جَنَبِ
الْمَسْجِدِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجْوُ مِنْ إِذَا رَجَعْتُ
إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَالِكَ كُلُّهُ.

উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তির ঘর নবী (স.) এর মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলো। কিন্তু তিনি প্রতি ওয়াক্ত নবী (স.) এর মসজিদে এসে নামায পড়তেন। কোন নামায (জামায়াত) না পড়ে ছাড়তেন না। কোন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, গরমের সময় এবং রাতে মসজিদে আসার জন্য একটি খচর কেন কিনছেন না? তিনি (আনসার) উত্তর দেন, আমি মসজিদের কাছে ঘর পছন্দ করি না। কারণ, আমি চাই আমি পায়ে হেঁটে মসজিদে যাই। আর যাওয়া আসায় যতো পদক্ষেপ গ্রহণ করি তা আমার আমলনামায লিখা হোক। রাসূল (স.) একথা শুনে বললেন : ওর প্রত্যেক পদক্ষেপের সওয়াব আল্লাহ তাকে দান করবেন। (মুসলিম)

মুমিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে

মুমিনের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই হলো সে মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বারণ করবে। এ দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। কুরআনুল কারীম তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُلُّهُمْ خَيْرٌ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

Ye are the best of peoples evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believeing Allah.

“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি (উচ্চত)। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বারণ (নিষেধ) করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” (সূরা আল ইমরান : ১১০)

সৎকাজের প্রতি আন্তরিক টান, সৎকাজের বিস্তৃতি এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ পক্ষান্তরে অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় কাজে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন সারাক্ষণ সৎকাজের চিন্তায় বিভোর থাকে। সৎকাজকে সর্বদা নিজের মধ্যে লালন করে থাকে এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে মুমিনের হৃদয়ের সকল অশান্তি ও অঙ্গুর উৎসাহ ও পাথেয় হলো অন্যায় কাজ। হরিণ যেমন বাঘের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। তেমনিভাবে মুমিন নিজেকে দুনিয়ার সকল অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে অর্থাৎ অসৎ কাজ আর মুমিনের মধ্যে সম্পর্কটি হল অহিন্কুল সম্পর্ক। কোন মতেই সে অসৎ কাজকে সহ্য করতে পারে না। শুধু তাই নয় যেই কাউকে অন্যায়ে লিঙ্গ দেখলে মুমিন বিব্রতবোধ করে। অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক যে ঘৃণা মুমিনের অন্তরে সে ঘৃণাই অন্যায়কে ঝুঁকে দাঁড়ানোর প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই কোন দ্বানি ভাই অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে না ফেরা পর্যন্ত মুমিন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

প্রতিটি মুমিনের উপরই সত্ত্বের প্রচার বা কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং অসত্য বা অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা কর্তব্য। এটি তার ঈমানের দাবি। এতটুকু কাজ যদি সে না পারে বুঝে নিতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নেই।

যতই সে নিজকে মুমিন বলে দাবি করুক না কেন আসলে সে মুমিন নয়। তাকে অবশ্যই তার অবস্থার আলোকে সত্য মিথ্যার পক্ষ-বিপক্ষ নিতে হবে। হাদীস শরীকে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلَا يَغِيرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقُلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَعْفُ الْإِيمَانِ — (مسلم)

হ্যরত আবু সাইদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে অবশ্যই তা হাত দিয়ে (ক্ষমতার আলোকে বল প্রয়োগে) স্তুত করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে সে মুখের (বুকানোর মধ্য দিয়ে) দ্বারা তা বন্ধ করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে সে অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম শর। (মুসলিম)

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ যখন মুছে যাবে কোন সমাজ থেকে, তখন সে সমাজে আল্লাহর আযাব ও গ্যব নেমে আসে। সে আযাব ও গ্যব থেকে মুক্তির জন্য যতই আল্লাহর কাছে দোয়া করা হোক না কেন কোন লাভ হবে না। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন—

عَنْ حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْلَيُوشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يَعْتَثِ
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَذْعَنُهُ فَلَا يُسْتَحْابُ لَكُمْ (ترمذি)

হ্যরত হ্যায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কর্নীম (স.) বলেছেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার গ্রাণ। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। নতুনা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নায়িল করে শান্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিয়ী)

দিনান্তিপাতে একজন মুমিনের অভ্যাসে পরিণত হবে যে, সে সৎকাজে লোকদের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। সে সহ্যই করতে পারবে না যখন দেখতে পাবে তার পাশে আল্লাহর কোন আদেশ বর্জন হচ্ছে অথবা কোন

নিষেধ গ্রহণ হচ্ছে। মুমিন নিজে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যেমন ব্যস্ত থাকবে তেমনিভাবে তার প্রতিবেশী ও পরিবারকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো মান্য করানোর মধ্য দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে।

আল্লাহ রাকুন্দ আলামীনের আদেশও অনুরূপ। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ.

O ye who believe! Save your Selves and your families from a fire whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe who flinch not (from executing) the commands do they receive from Allah, but do (precisely) what they are commanded.

“হে মুমিন লোকসকল! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জুলানী হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে ঝুঢ়ি স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।” (সূরা আত তাহরীম : ৬)

আল্লাহর আয়ার থেকে শুধু কেবল নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষ রূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা। তার সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে সুস্থি হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইঙ্কন না হয়। আর মনে রাখতে হবে নিজের অসচেতনতার কারণে যদি নিজ পরিবারের সদস্যরা জাহান্নামের ইঙ্কন হয় তাহলে যতই আপনি আমলদারী হোন না কেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকবে। আপনার প্রতিবেশী বা

পরিবারের মধ্যে যারাই আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাদের ব্যাপারে জবাব দিয়ে তারপরই আপনার আমল বলবে আপনি জাহানামে যাবেন না কি জান্নাতে যাবেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো—

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী)

একজন মুঘিনের বৈশিষ্ট্য কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে শুধু মসজিদে মসজিদে ঘুরে আল্লাহ-বিল্লাহ করবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে আর মসজিদের বাহিরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য হতে চলবে এবং অন্যায় কাজে সমাজ হেয়ে যাবে। সে এ বিষয়ে তেমন কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করবে না। নিজে মসজিদে নিরাপদে ঘুমাবে আর বাহিরে মানবতা ধ্বংসিত হতে থাকবে। শয়তানের রাজত্ব চলবে, দুর্চিরিত্বের কর্তৃত্ব চলবে, যশুম শাহীতে ভূবে মরবে দেশ ও জাতি। তা কখনোই হতে পারে না। তা না হয় আল্লাহর রাসূল (স.) কেন তায়েফের ময়দানে রজাক হলেন! উত্তরের ময়দানে কেন দস্ত মোবারক হারালেন? অথচ আল্লাহ রাকুল আলামীন তাঁর আগের ও পরের পুরো জীবনকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন তার সাক্ষী—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا — لَيُغَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَمَا تَمْ —
وَمَا تَعْلَمَ — نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَبِهِدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا .

Verily we have granted thee a manifest victory. That Allah may forgive thee thy faults of the past and those to follow, fulfil His favour to thee, and guide thee on the Straight way.

“(হে নবী) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করোছি, যাতে আল্লাহর আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি-বিচুতি মাফ করে দেন। আপনার জন্য তাঁর নিয়মতত্ত্বকে পূর্ণত্ব দান করেন এবং আপনাকে সহজ সরল পথ দেখিয়ে দেন।” (সূরা ফাতহ : ১-২)

মুঘিনদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আল্লাহর জান্নাত সরবি কলা আর দুধের সরের মধ্যে নয় বরং জান্নাত হলো তরবারির অগভাগে। জান্নাত পাওয়া সহজ বিষয় নয়। ঈমান এনে আপনি নিজেকে মুঘিন বলে দাবি করলেই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন না। বরং জান্নাত দানের আগে আল্লাহ আপনাকে

অনেক পরীক্ষা করবেন যেমন পরীক্ষা করেছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীদের। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলে আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেতে হবে। একজন ছাত্রকে যেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার কেন্দ্রে বা হলে যেতে হয়। পরীক্ষার হলে না গেলে পরীক্ষার চাপ পায় না এবং পরীক্ষা দিতে পারে না। যার ফলে সে পরীক্ষার সুফল নিজের জীবনে বয়ে আনতে উপযোগী বা সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভের পরীক্ষার কেন্দ্র বা হল হলো সত্য প্রতিষ্ঠা মিথ্যা উৎখাতের আন্দোলনের ময়দান বা রাজপথ, মসজিদ নয়। মসজিদ পরিকল্পনার কেন্দ্র হতে পারে কিন্তু লড়াইয়ের কেন্দ্র নয়। যে বা যারা সে ময়দান বা রাজপথ নামক পরীক্ষার কেন্দ্রে না যাবে সে পরীক্ষার চাপ বা সুযোগ পায় না এবং পরীক্ষা দিতে পারে না। যার ফলে সে পরীক্ষার সুফল নিজের পরকালীন জীবনে বয়ে আনতে সক্ষম বা উপযোগী হবে না। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ — وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

Do men think that they will be left alone on saying, we believe and that they will not be tested? We did test those before them, and Allah will certainly know those who are true from those who are false.

“মানুষ কি ভেবে নিয়েছেন, ‘স্মান ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তারা ছাড় পেয়ে যাবে এবং কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্য আন্দোলনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।” (সূরা আল আনকারুত : ২-৩)

ঈমান কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার নাম নয় বরং ঈমান হলো একটা শুরুতর দায়িত্বপূর্ণ আকিন্না। একটি ঝুঁকিপূর্ণ আমানত, এমন একটি জিহাদ যা জয় করতে ধৈর্যের প্রয়োজন এবং এমন এক সাধনা যার সাফল্যের জন্য সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। সুতরাং এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি ঈমান এনেছি’ এ দাবি করেই শুধু ঘরে মসজিদে যাতায়াত করবে। বরং এ দাবি করার পর ব্যক্তিকে অবশ্যই সত্য মিথ্যার পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতে হবে। যার ফলে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আর সে পরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে, তার ঈমানে

কিছুমাত্র ভেজাল অবশিষ্ট থাকবে না এবং সামান্যতম দুর্বলতা আসবে না। সোনা আগুনে পোড়ালে যেমন তার খাদ পৃথক হয়ে যায় তদ্বপ আল্লাহর নেয়া পরীক্ষায় ইমান ও বেঈমানকে পৃথক করে ইমানকে খাঁটি করে ভোলে।

ইমানের পরীক্ষা আল্লাহর চিরস্থায়ী মূলনীতি। যে কেউ নিজেকে মুমিন বলে দাবি করলেই তার উপর পরীক্ষা অপরিহার্য হয়ে যায়। যক্কার যে ব্যক্তিই নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিতো এবং সত্য যিথ্যার পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতো। সৎকাজের আদেশ দিতো আর মন্দ কাজ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। তখন তার উপর পরীক্ষাস্বরূপ বালা-মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এমন নির্যাতন-নিপীড়ন এসে পড়তো যে, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমায়ীন অতীঠ হয়ে যেতেন। তার একটি প্রমাণ হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় : হ্যারত খাবাব (রা.) বলেন; একদিন আমি দেখলাম বিশ্বনবী (স.) ছাদ বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। আমি উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহি (স.) আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? আমরাতো আর নির্যাতন সহ্য করতে পারছি না, যার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেলাম।

এই কথা শুন মাত্র নবী করীম (স.) এর মুখ্যমন্ত্র আবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন : “হে খাবাব, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইমানদারদের উপরতো এর চেয়েও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। তন্মধ্যে কোন কোন ইমানদারকে ধরে এনে যমীন গর্ত করে কোমর পরিমাণ গেঁড়ে দিয়ে তাঁর মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাঁকে দ্বিষ্ঠিত করা হতো। কারো কারো গায়ের গোস্ত লোহার চিরুনি দিয়ে ছিন্ন ডিন্ন করে ফেলা হতো। এই সব কিছুর মূল উদ্দেশ্যাই ছিল লোকদিগকে ইমান থেকে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহর কসম! মুমিনদের এই ত্যাগ ও সাধনা পূর্ণ হবেই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা, এমন হবে যে, এক ব্যক্তি সানয়া হতে হাদরামাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে এবং এ সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো ডয় তার মধ্যে থাকবে না।”

সুতরাং একজন মুমিন, পথ যত কঠিনই হোক না কেন সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষকে বারণ করেই যাবে। কোন বাধাই তাকে কৃত্বে দিতে পারবে না। বরং সে এ নীতিতেই বিশ্বাসী হবে যে,

বিড়ালের ন্যায় নয় বাঁচিব হাজার দিন,
বাঁচিব সিংহের ন্যায় হাজারের একদিন।

মুমিন আল্লাহ দেয়া সীমা রক্ষা করে

সূর্য উদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয় এবং সূর্য অন্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শেষ হয় অর্থাৎ রাতের আগমন ঘটে আবার সূর্য উদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শেষ হয় অর্থাৎ দিনের যাত্রা শুরু হয়। এ রুটিন হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনেরই কর্মের ও হৃকুমের বহিঃপ্রকাশ। এ রাত আর দিনের আলোকেই মানুষকে তার কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হয়। এ কর্মসূচী একেক জন একেক পছায় সম্পাদন করে থাকে। কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীকে কেন্দ্র করে, কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন তত্ত্ব-মন্ত্র ও দলকে কেন্দ্র করে আবার কেউ সম্পাদন করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনকে তথা তাঁর বেধে দেয়া সীমারেখাকে কেন্দ্র করে। আর যারা আল্লাহ দেয়া সীমারেখায় তাদের দিনাতিপাত করে থাকে তারাই হলেন মুমিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيُشَرِّعُ الْمُؤْمِنِينَ.

And observe the limits set by Allah, (those do rejoice) So proclaim the glad tidings to the Believers.

“তারা (মুমিনরা) আল্লাহর দেয়া সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।” (সূরা আত তাওবা : ১১২)

মুমিনগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ দেয়া সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছাকৃত নিজেদের জীবন পরিচালনা করে না। এখানে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা বলতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হৃকুম-বিধানকেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ, চিন্তা-চেতনা, আনুগত্য-অনুসরণ, ঈমান, আকিদা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিকতা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক, একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক কথায় মানব জীবনের রান্নাঘর থেকে পল্লী ভবন পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে আদালত পর্যন্ত, ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের জন্য একমাত্র বিধানদাতা আল্লাহ রাবুল আলামীন যে নীতি-নির্ধারণ দান করেছেন সেই নীতি নির্ধারণই হলো আল্লাহ দেয়া সীমারেখা।

মুমিন ব্যক্তি এই সীমার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে দিনাতিপাত করবে। নিজের

ব্যক্তিগত হোক অথবা সমষ্টিগত হোক সকল কর্মকাও এই সীমাবেষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখবে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামত কাজ করবে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনকে বা মানুষের তৈরী করা ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সতর্কমূলক ভাষা দিয়ে অবগত করে দিয়েছেন। কুরআনুল কারীম তার সাক্ষী-

وَمَنْ يُتَّسِعَ غَيْرُ إِلْسَامٍ دِيَنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

If anyone desires a religion other than Islam (Submission to Allah), never will it be accepted of him, and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost.

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আবেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের (ব্যর্থ, আশাহত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত) অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আল ইমরান : ৮৫)

আল্লাহ দেয়া সীমাবেষ্টি একটি ব্রতস্তু চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। যার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত বা বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদয়াত ও পথ নির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। দীনকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যথেষ্ট (Enough) করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন মুমিনদের গলায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃঙ্খল নেই। এখন আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন মুমিনরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকারী, ঠিক তেমনি কর্ম জীবনেও আল্লাহর ছাড়া আর কারোর আনুগত্যকারী নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَطْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ إِلْسَامٌ دِيَنًا.

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবনব্যবস্থা) কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে দিয়েছি।” (সূরা আল মায়েদা : ৩)

মানুষ দিনের পর রাত রাতের পর দিন এর মাঝে অতিবাহিত করে তার জীবন। তবে এক্ষেত্রে মুমিনের একটি কেন্দ্র বিন্দু রয়েছে, সেই কেন্দ্র বিন্দুর আলোকেই সে তার জীবন পরিচালনা করে থাকে। মুমিন পার্থিব জীবনে যা কিছুই করুক না

কেন, তার অঙ্গর দৃষ্টি থাকে সেই কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে, আর সেই কেন্দ্র-বিন্দুর নাম হলো আল্লাহর রাব্বুল আলামীন কর্তৃক দেয়া সীমারেখা অর্থাৎ মহাঘন্ত আল কোরআনুল কারীম। এই জন্যই রাসূল (স.) মুমিনের জীবনকে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া যেমন খুঁটির চতুর্দিকেই ঘূরতে-ফিরতে পারে কিন্তু খুঁটিকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ
وَمَثَلُ الْأَيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي احْتِيَهِ يَحْوُلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى احْتِيَهِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ
يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْأَيْمَانِ فَأَطْعَمُوهُ طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءِ وَأُولُوْ مَعْرُوفَكُمُ
الْمُؤْمِنِينَ.

“হ্যরত আবু সাইদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি
ও ঈমানের উপমা হচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া। সে চতুর্ভুজীয়ার মধ্যে ঘুরে ফিরে
আবার খুঁটির কাছে চলে আসে। অনুরূপভাবে মুমিন ব্যক্তি ভুল করে বসে, কিন্তু
পুনরায় ঈমানের দিকে ফিরে আসে।

অতএব তোমরা মুসলিম লোকদের নিজেদের খাবার খেতে দাও এবং
ঈমানদারদের সাথে সদয় ব্যবহার করো।” (বায়হাকী)

মুমিন কখনো নিরাশ ও হতাশ হয় না

একজন খাঁটি মুমিনের হৃদয়ে কখনো কোন হতাশা ও নিরাশা কাজ করবে না
এবং বাসা বাঁধবে না। কোন দুঃখ বেদনায় সে ডেঙ্গে পড়বে না। কারণ হলো
মুমিন বিশ্বাস করে— (ভালো হোক মন্দ হোক সবই
আল্লাহর পক্ষ থেকে আগর্ত)। তার ভালো মন্দের চাবি কাঠি আল্লাহর হাতেই
নিবন্ধ। পৃথিবীর কেউই তার কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই সাধন করতে পারবে
না। মুমিনদের হৃদয়ে যখন কোন বিপদ-মুসিবত আসে, তখন তারা বিচলিত হয় না
এবং হতাশাহ্নস্ত হয়ে পড়ে না বরং ধৈর্যের পরম পরাকার্তা দেখিয়ে বলে—

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ.

Who say, when afflicted with calamity : to Allah we belong, and
to Him is our return.

“(মুমিন লোকেরা এমন যে,) কোনো বিপদ যখন তাদেরকে বেঠন করে তখন তারা বলে, আমরা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই দিকে ফিরে যাব।” (সূরা আল বাকারা : ১৫৬)

নমরূদ যখন হ্যরত ইবরাহীম (আ.) কে আগনে নিক্ষেপের সকল প্রস্তুতি শেষ করলো। ইবরাহীম (আ.) দেখতে পাচ্ছেন আগনের কুণ্ডলি তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হলো অত্যন্ত উৎসুকভাবে। চারদিকে সবাই প্রদক্ষিণ করতে প্রস্তুত। সবাই এ আনন্দ উৎসব উদয়াপনে মানসিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। ইবরাহীম (আ.) লক্ষ করলেন, নমরূদ তাঁকে এখনই আগনে নিক্ষেপ করবে যার মধ্য দিয়ে নমরূদের দৃষ্টিতে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলার মতো আর কেউই থাকবে না। একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব ও প্রভৃতি কার্যে থাকবে। তাঁর বিরক্তে কথা বলার মতো কেউই থাকবে না। সে যা বলবে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমনটি চিন্তা করেছিল দারুন নদওয়ার বৈঠকে- মুহাম্মদ (স.) কে শেষ করে দিতে পারলেই আমরা এবং আমাদের মৃত্যুগুলো বেঁচে যাই।

এমনি মুহূর্তে ফেরেশতারা চলে আসলো ইবরাহীমের ধারে সাহায্য করার প্রত্যয়ে। ফেরেশতারা এসে বললো, হে ইবরাহীম আমাদের কাছে সাহায্য চাও আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেই, পূর্ণ মুমিন হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : হে ফেরেশতারা, তোমরা চলে যাও আর আমাকে পরীক্ষায় উন্নীর্ণ হতে দাও। আমিতো এমন আল্লাহর ইবাদত করি না যিনি আমার দুঃখ-দুর্দশা ৰ-চক্ষে দেখেন না। আমি আগনে পুড়ে মারা গেলে যদি আমার আল্লাহ খুশি হন তাহলে আমার এমন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাজার বারও আগনে পুড়তে রাজি আছি। অমিনভাবে আল্লাহ তায়ালা আগনের প্রতি নোটিশ জারি করে দিলেন-

فُلْنَا يَا نَارُ كُونْيٰ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.

We said, o fire! be thou cold, and (a means of) safety for Abraham!

“হে আগুন, আমার ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কারণ আগুন তো হলো সৃষ্টি আর আল্লাহ হলেন সৃষ্টি। তাই আগুন তো আল্লাহর কথাই শুনবে। রাসূলের চাচা এবং তাঁর স্ত্রী যখন জানতে পারলো তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা

লাহাব অবতীর্ণ হয়েছে তখন সে পাথর খও নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করার জন্য বসে থাকলো ।

কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.) আবু বকরকে সাথে নিয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন । মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীন আবু লাহাবের চোখ থেকে তাঁর রাসূলকে অদৃশ্য করে দিলেন । আবু লাহাব হ্যরত আবু বকর (রা.) কে জিজেস করলো কোথায় মুহাম্মদ (স.)? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে । তাঁকে এখন কাছে পেলে এ পাথর দিয়ে আঘাত করতাম ।

একথা বলে আবু লাহাব গর্বিত ভঙ্গিতে চলে গেলো । হ্যরত আবু বকর (রা.) রাসূল (স.) থেকে জানতে চাইলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেলো না কেন?

বিশ্বনবী (স.) উভর দিলেন : “হে আবু বকর! সে আমাকে দেখতে পায়নি । কেননা আল্লাহ তায়ালা তার চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সে আমাকে দেখতে না পায় ।” (সুবহানাল্লাহ)

অর্থাৎ সৃষ্টি যার হৃকুম চলবে তার। আল্লাহর সৃষ্টি আগুন নির্দেশ পেলো ইবরাহীমের প্রতি এয়ার কঢ়িশন হওয়ার জন্য আগুন দেরি করেনি । উভঙ্গ আগুন এয়ার কঢ়িশনে পরিণত হয়ে গেলো ।

হ্যরত ইবরাহীম (আ.) হতাশ হলেন না, নিরাশ হলেন না, বরং তিনি এক আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছিলেন, যার ফলে মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীনের আদেশে আগুনের কুণ্ড ফুল বাগানে পরিণত হয়ে যায় । এই জন্যই বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

‘আজডি হো যো ইবরাহীম কা ইমা পয়দা,

আগকার ছাকতি হ্যায় এক আন্দাজে শুলিস্তা পয়দা ।’

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ.) এর ন্যায় ঈমান যদি বর্তমানেও কারো ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্যও প্রজ্ঞালিত আগুন ফুলের বাগানে পরিণত হতে পারে । কেননা ইবরাহীমকে বাঁচিয়ে ছিলেন যে আল্লাহ রাবুল আলামীন সে আল্লাহ কর্তৃত সহকারে আজও বিদ্যমান রয়েছেন ।

মুমিন কখনো হতাশ হবে না নিরাশ হবে না । জীবনের সর্বশেষ পর্যন্তও মুমিন আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে সে বিশ্বাস করবে তার কল্যাণ অকল্যাণের নির্ধারক

হলেন একমাত্র শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহ রাবুল আলামীন। তিনি যদি তাকে কোন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা নিতে চান, তবুও সে হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপরই ডরসা করবে। কেননা সে জানে আল্লাহই বলেছেন যে, তিনি মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন যাঁ: পরিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَنَبْلُونُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثِّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔

Be sure we shall test you with Something of fear and hunger, some loss in goods, lives and the fruits of (your toil), but give glad tidings to those who patiently persevere.

“আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হাসের মাধ্যমে তোমাদের (মুমিনদের) পরীক্ষা করবো।” (সূরা আল বাকারা : ১৫৫)

উক্ত আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় হযরত আয়ুব (আ.) এর জীবনে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী হযরত আয়ুব থেকে সকল দিক থেকে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আয়ুব (আ.) এর ধন-সম্পদ, ছেলে-সন্তান, আজীয়-স্বজন সবকিছু তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেলো। দেহ পঁচে গেলো-পোকা ধরলো। যার কারণে আল্লাহ ছাড়া তাঁর কাছে কেউই রাইলো না। এরপরও তিনি সামান্যতম হতাশ হননি, নিরাশ হননি। বরং সর্বশেষ যখন তাঁর জিহ্বাতেও পোকা ধরলো তখন তিনি শুধু এতটুকুই বললেন- যা পরবর্তীতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

When he cried to his Lord truly distress has seized me, but thou art the Most Merciful of those that are Merciful.

“স্মরণ করো, যখন সে (আয়ুব) তার রবকে ডাকলো, আমি রোগঘন্ত হয়ে গিয়েছি আর তুমি করণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করণাকারী।” (সূরা আল আমিয়া : ৮৩)

কঠিন এ মুহূর্তে হযরত আয়ুব (আ.) যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর সে

ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আবীমের মালিক আল্লাহ রাকুন আলামীন তাঁকে
যে সনদ দান করেছেন যা মুসিনদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। আল্লাহ বলেন-

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

Truly we found him full of patience and constancy. How excellent is the servant, Ever did he turn (to us)!

“আমি তাঁকে (আয়ুবকে) সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, সে নিজের
রবের অভিযুক্তি।” (সূরা সান্দ : ৪৪)

এমনই হন আল্লাহর প্রিয় মুসিন বান্দাগণ! যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের
মুখোমুখি হন তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করবেন না বরং দৈর্ঘ্য
সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য
তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি
বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তার থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত
পাতবেন, এমন পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেন না। বরং, তারা ভালো করেই
জানেন যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তাই বিপদের ধারা
যতই দীর্ঘ হোক না কেন তাঁরা কেবল তারই করুণা প্রার্থী হন। এজন্য তারা
এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হয়রত আয়ুবই (আ.) যথেষ্ট!

বিপদ-মুসিবত যতই কঠিন হোক না কেন মুসিন তা খুব সহজেই হজম করে
চলে। সে কখনো মিথ্যার কাছে মাথা নত করে না। যেমনটি মাথা নত করেননি
ইতিহাসের অন্যতম নির্যাতনের স্বীকার হয়রত বিলাল (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করার
পর তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো।
ফিথহরের ক্ষরতাপে অগ্নিস্নাত তঙ্গ বালুকার উপর সে হয়রত বিলালকে চিৎ করে
শয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। উপরে প্রচণ্ড সূর্যোত্তাপ-
নিচে আগনের কয়লার মতো বালু। তার ওপর চাবুকের আঘাত। মাঝে মাঝে
ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দেয়া হতো। যার ফলে পুরো দেহ
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো। এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের উদ্দেশ্যই ছিল হয় তিনি
মারা যাবেন, নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন।

কিন্তু আল্লাহর প্রিয় মুসিন বান্দা-মর্দে মুজাহিদ প্রিয় আল্লাহকে ভুলেননি বরং নিষ্ঠুর
কাফেরেরা যখন মাঝে মধ্যে আঘাত বক্ষ করে বলতো বিলাল- এখন তোর
আল্লাহকে ভুলে যা। মুহাম্মদ (স.) এর দ্বীন থেকে বেরিয়ে আয়। লাত-মানাতের

উপর ঈমান আন, তাহলেই কেবল মুক্তি, না হয় মৃত্যু। এমনি মুহূর্তে হ্যরত
বিলাল (রা.) শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে বলতে লাগলেন

اَحَدٌ اَحَدٌ لَا إِلَهَ اِلَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

তেমনিভাবে নির্যাতন সহ করেছিলেন হ্যরত খাবাব (রা.)। তাঁর প্রতি কাফের
বেঈমানদের অত্যাচারের অবধি ছিল না। লোহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের
মহাভূমির প্রচও রোদে শায়িত করে রাখা হতো। রোধের তাপে তাঁর শরীর থেকে
বিগলিত ধারায় ঘর্ম নির্গত হতো। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে উত্পন্ন বালুতে শয়ন
করে রাখা হতো।

উভাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত। যার ফলে হ্যরত খাবাবের
কোমরে অনেক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়।

একদিন খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হ্যরত খাবাব রাদিআল্লাহু
তায়ালা আনহুকে তাঁর প্রতি ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানতে চাইলে
হ্যরত খাবাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। হ্যরত
ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কোমর দেখে বললেন আল্লাহর কসম!
এমন কোমর তো আমি কখনো দেখিনি। হ্যরত খাবাব রাদিআল্লাহু তায়ালা
আনহু বললেন- ‘আমাকে আগন্তের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। এরপর আমার
রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিতে যেতো।’

মৃলত এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সেই কল্যাণ ও
মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ, যে সমাজ পৃথিবীর বুকে বিশ্ব
মানবতার বক্ষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার
দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ, লুঁটন, নির্যাতন-
নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি লাভ করে একটি
সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণযুক্ত ভীতিহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ লাভ করতে
সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চারিত্বিক ভূমণে পরিণত করতে
সক্ষম হই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাদের সকলকে
আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান
করুন। আমীন।

একনজরে আল কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য

০১.	সূরা আল বাকারা	:	৩, ১৭৭
০২.	সূরা আল ইমরান	:	১৫-১৭
০৩.	সূরা আন নিসা	:	১২২
০৪.	সূরা আল মায়দা	:	০৭
০৫.	সূরা আল আনফাল	:	১-৮, ৭৪-৭৫
০৬.	সূরা আত তাওবা	:	১৩-১৫, ১৮, ৪৯, ৭১, ৮৮, ৯৯, ১১১-১১২, ১১৯
০৭.	সূরা ইউনুস	:	১০৮
০৮.	সূরা হৃদ	:	৮১, ১১২-১১৩
০৯.	সূরা আর রাঁদ	:	২০-২২, ২৮-২৯
১০.	সূরা ইবরাহীম	:	১১-১২
১১.	সূরা আল কাহফ	:	২২-২৪
১২.	সূরা আল মুমিনুন	:	১-১১, ৫৭-৬১
১৩.	সূরা আন নূর	:	৩৬-৩৭, ৫১-৫২, ৬২
১৪.	সূরা আল ফুরকান	:	৬৩-৭৫
১৫.	সূরা আন নামল	:	১-৮
১৬.	সূরা আল আনকাবৃত	:	২৪
১৭.	সূরা আস সাজদাহ	:	১৫-১৬
১৮.	সূরা আল আহ্যাব	:	২২-২৩, ৩৫
১৯.	সূরা আল ফাতির	:	২৮-২৯
২০.	সূরা ইয়াসিন	:	১১
২১.	সূরা আয যুমার	:	০৯
২২.	সূরা আল মুমিন	:	৫৫
২৩.	সূরা হা-মীম আস সাজদাহ	:	৩৩-৩৬
২৪.	সূরা আশ শূরা	:	১৭-১৮, ৩৬-৩৯
২৫.	সূরা আয মুখরক্ষ	:	৬৭-৬৯
২৬.	সূরা আল হজুরাত	:	১০
২৭.	সূরা আত তাহরীম	:	০৫
২৮.	সূরা আল মা'আরিজ	:	২৩-৩৫
২৯.	সূরা আদ দাহর	:	০৫-১১
৩০.	সূরা আন নাথিয়াত	:	৮০-৮১
৩১.	সূরা আল আ'লা	:	১৪-১৫
৩২.	সূরা আল বার্যিনাহ	:	৭-৮
৩৩.	সূরা আল আসর	:	০৩



আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

www.ahsanpublication.com



ISBN : 978-984-8808-41-2